জুলাই ২০২৩ ■ আষাঢ়- শ্রাবণ ১৪৩০

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

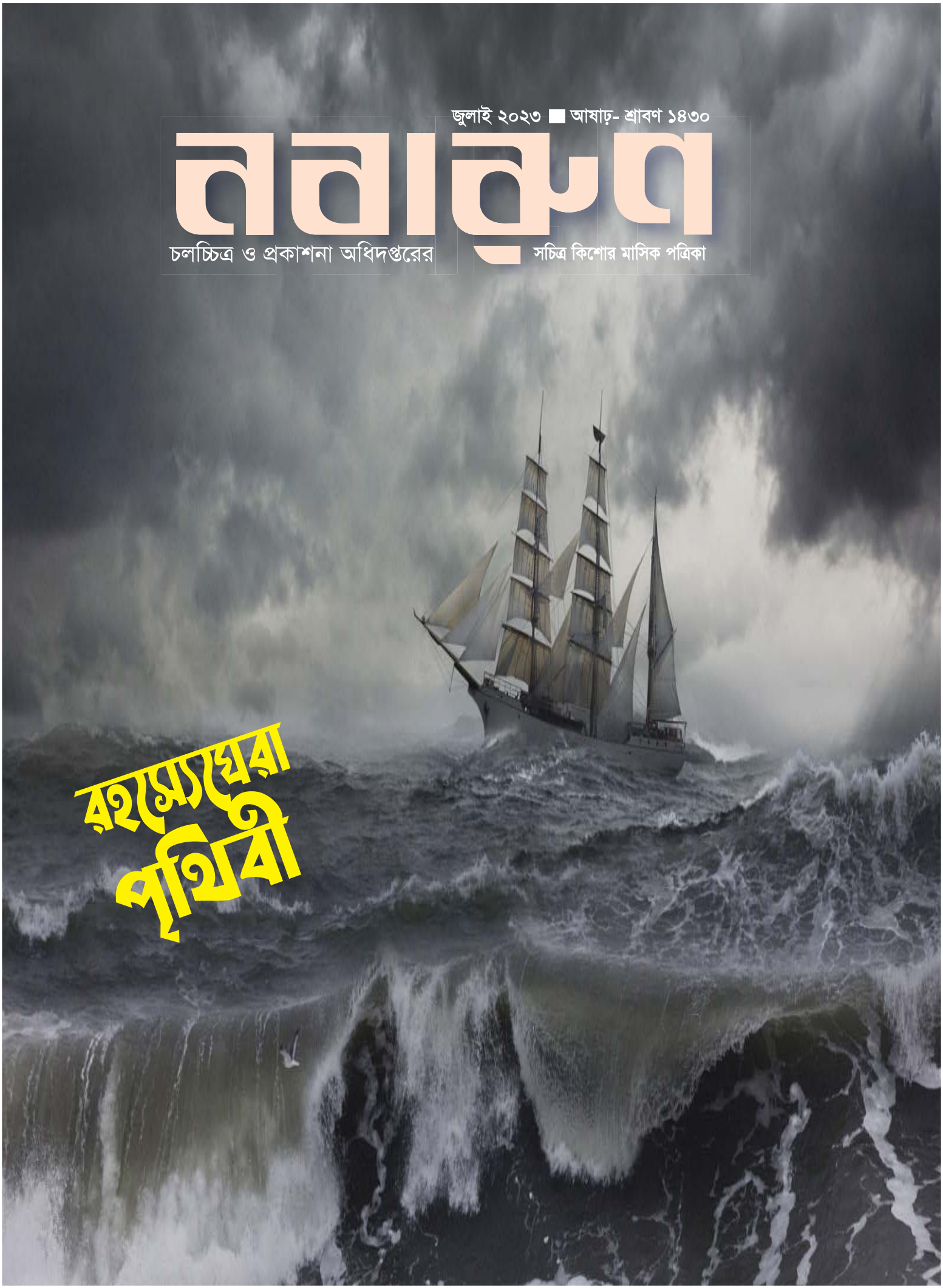

রহস্যেঘেরা পৃথিবী

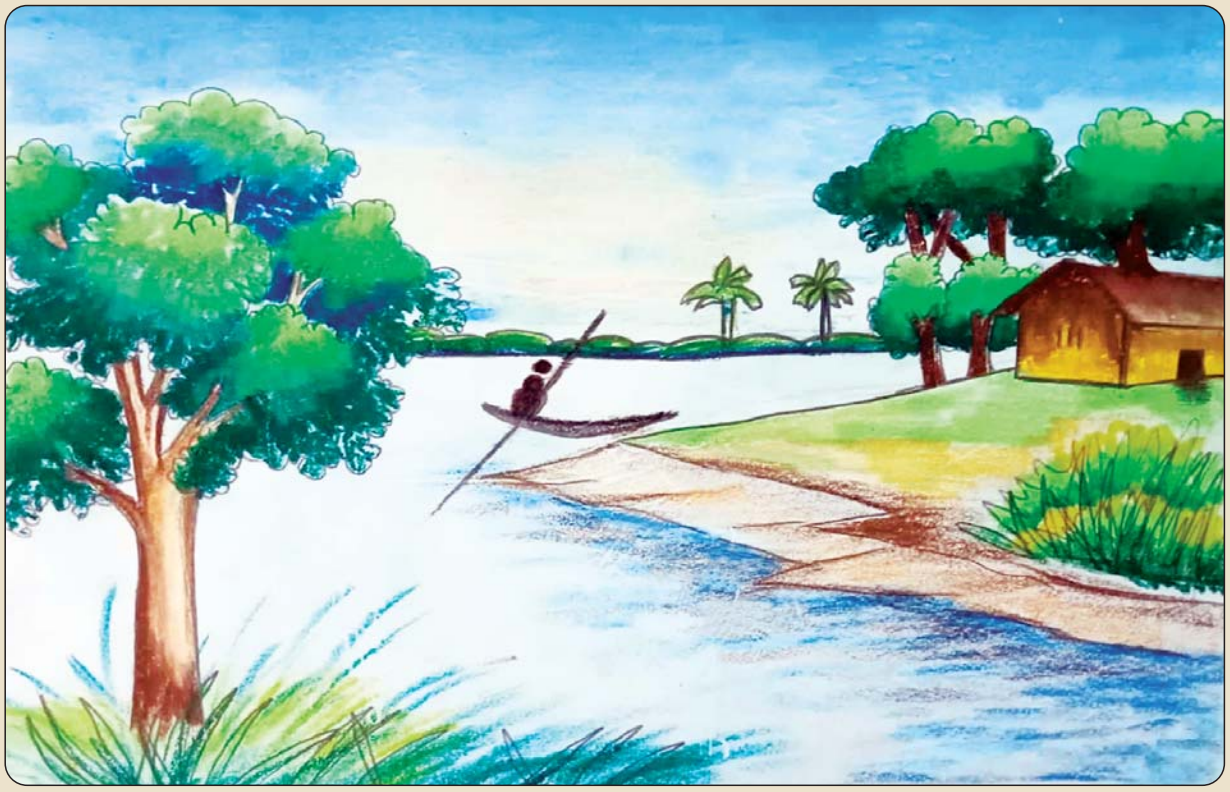

নাওয়ার আলম এথেনা, সপ্তম শ্রেণি, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুল, ময়মনসিংহ

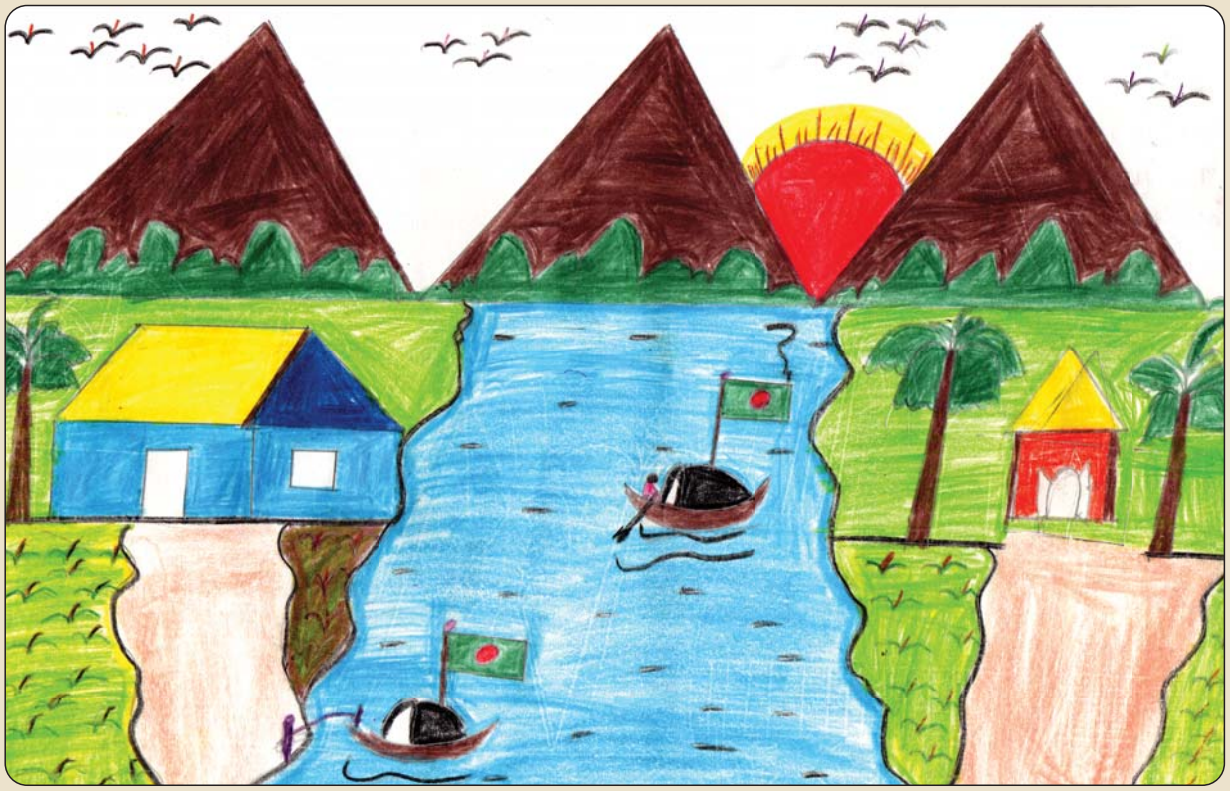

ঐতিহ্য গোলদার, তৃতীয় শ্রেণি, এম. বদিউজ্জামান বিদ্যানিকেতন, মোল্লাহাট, বাগেরহাট

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, আশা করি তোমরা ভালো আছো। আমাদের এই পৃথিবী বড়োই রহস্যময়। পৃথিবীর অনেক সৃষ্টি আছে যা আমাদের কাছে বিস্ময়কর। বিশ্বের প্রতিটি কোণেই লুকিয়ে আছে অজানা অনেক কিছু যা আমাদের কাছে রহস্যময়। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এসব রহস্যের তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিস্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু রহস্যের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, আবার কিছু রহস্য ভেদ করা এখনো সম্ভব হয়নি। যেমন গভীর সমুদ্রে যে অপার বিস্ময় ছড়িয়ে আছে তার অধিকাংশই আমাদের অজানা।

বন্ধুরা, আমরা জানবো পৃথিবী ও সমুদ্রের এমন কিছু রোমাঞ্চকর জায়গা সম্পর্কে যা আমাদের বিস্মিত করে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, স্নেক আইল্যান্ড, এরিয়া ৫১, এলিয়েন গবেষণা কেন্দ্র, ডোর টু হেল, রাজস্থানের ভানগড় দুর্গ, ড্যান্সিং ফরেস্ট এবং মেরুজ্যোতিসহ আরো অনেক রহস্যময় স্থান ও বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা ছাড়াও এ সংখ্যায় রয়েছে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ও কবিতা।

ঋতু হিসেবে আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস বর্ষাকাল। বর্ষার প্রথম মাস আষাঢ়। বাঙালির জীবনে আষাঢ় মানেই বৃষ্টিমুখর দিন। সেই সঙ্গে ভেজাস্নিগ্ধ শীতল শিহরণ, মাতাল হাওয়া। মনপ্রাণ আনচান করে ওঠার দিন। এ সময় হরেক রকম মৌসুমি ফল পাওয়া যায়। অনেক বাহারি ফুলের ঘ্রাণে চারপাশ ভরে ওঠে।

বন্ধুরা, বর্ষাকালের এই সময়টিতে ডেঙ্গু ও অন্যান্য রোগের প্রকোপ খুব বেড়েছে। তোমরা এই সময়টায় খুব সাবধানে থাকবে। বাড়ির আনাচে-কানাচে কোথাও যেন পানি জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখবে।

ভালো থেকো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য শুভকামনা।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
ডালিয়া ইয়াসমিন

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৮৮

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৩ গভীর সমুদ্রের অতল রহস্য ও প্রকৃতির বিস্ময়
ডালিয়া ইয়াসমিন
১৮ বিস্ময়কর লেক ও ঝরনা/নুসরাত জাহান
৩০ রহস্য কথা/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৩৫ অমীমাংসিত রহস্য/শাহানা আফরোজ
৪৪ অলৌকিক প্রকৃতি/মিজানুর রহমান মিথুন
৪৬ অদ্ভুতুড়ে/মেজবাউল হক
৫০ গুপ্তকথা/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৫৫ বিশ্বের বিস্ময়/মো. জামাল উদ্দিন

গল্প

০৯ একরোখা রতন/ধ্রুব নীল
১৪ খবর আছে! খবর!! /নাসরীন মুস্তাফা
২৩ বয়স কমে যায় যে গ্রহে/ আশরাফ পিন্টু
২৬ রুভার টাইম মেশিন/ তাপস কুমার দত্ত
৪১ পার্থিব স্মারক কয়েন/ সৌর শাইন

প্রতিবেদন

৬০ এসএসসিতে এগিয়ে মেয়েরা/ জান্নাতে রোজী
৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

কবিতাগুচ্ছ

২৫ আলম শামস/ আশিষ কুমার দত্ত
৩৩ অজিত রায় ভজন
৩৪ সালাম ফারুক/ রানা কুমার সিংহ
৫৬ তাফাজ্জল তালুকদার
৫৭ নকুল শর্ম্মা/ কবির কাঞ্চন
৫৮ এম. আবু বকর সিদ্দিক/ কনক কুমার প্রামানিক
মিনহাজ উদ্দীন শরীফ

ছোটোদের ছড়া

৫৪ মাহমুদ নাজীব
৫৯ লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা/আবির হোসেন
সানজিদা রীমা
৬২ মো. জুনায়েদ আহমেদ

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : নাওয়ার আলম এথেনা
ঐতিহ্য গোলদার
শেষ প্রচ্ছদ : উম্মে মেহজাবীন রাইশা
৬০ ফারিন আজিজ
৬৩ সিরাজুম মুনিরা বিভা/ ইসরাক হাসান আদৃক
৬৪ রুতবাহ জামান শিজা/ মো. আমিমুল ইহসান বসুনিয়া

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (*Nobarun Potrika*) আপলোড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট *www.dfp.gov.bd*-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

গভীর সমুদ্রের অতল রহস্য ও প্রকৃতির বিস্ময়

ডালিয়া ইয়াসমিন

সমুদ্র এক সীমাহীন রহস্যের আধার। সমুদ্রের গভীরে এত বিস্ময় ছড়িয়ে রয়েছে যা মানুষের কল্পনার বাইরে। সমুদ্রের মাত্র ৫-৭ ভাগ রহস্য আমাদের জানা, বাকি সবই অজানা। এছাড়া পৃথিবীর অনেক সৃষ্টি রহস্য দেখে আমরা বিস্ময় প্রকাশ করি। শুধু তাই নয় এসব রহস্যের সাথে যদি থাকে ভয়ংকর কোনো কাহিনি, বিষয় বা স্থান তাহলে তা আমাদের কাছে হয়ে ওঠে রোমাঞ্চকর ও রহস্যময়। জানবো এমন কিছু স্থান সম্পর্কে—

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

বন্ধুরা, তোমরা সবাই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কথা কমবেশি শুনেছ। পৃথিবীর বুকে অজানা রহস্যে ঘেরা যত স্থানের নাম জানা যায় তার মধ্যে অন্যতম বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল একটি ত্রিভুজাকৃতির জায়গা বিশেষ। যার এক পাশে রয়েছে ফ্লোরিডা, অন্যপাশে বারমুডা আর অপরপাশে আছে সান জুয়ান, পুয়ারতো রিকো। পৃথিবীর অন্য যত রহস্যে ঘেরা স্থান তার থেকে এই জায়গাকে গুরুত্ব দেওয়ার মূল কারণ হলো ভয়াল পরিবেশে নৌযান ও আকাশযানের বহু যাত্রীর অকাল

প্রাণহানি। এ এমন এক জায়গা যেখানে একবার প্রবেশ করলে সেখান থেকে বের হবার বা কোনো তথ্য বের করে আনার কোনো অবকাশ নেই। অনেকে আবার এই জায়গাকে ডেভিল ট্রায়াঙ্গল ও ট্রাপিজিয়াম আকৃতির বলে থাকেন।

সর্বপ্রথম এই জায়গার আবিষ্কার করেন আমেরিকার আবিষ্কারক ক্রিস্টোফার কলম্বাস। কলম্বাস তার লগবুকে লিখেছেন, এই ত্রিভুজাঞ্চল জুড়েই নাকি তাঁর নাবিকেরা ভূতুড়ে সব কাণ্ডকারখানা দেখেছেন। এ সময় তাদের কম্পাস ঠিকমতো কাজ করছিল না, তারা দেখেছেন ভূতুড়ে আলোর নাচন। এই লগবুকই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। ধারণা করা হয়, এ পর্যন্ত ৫০টি বাণিজ্যিক জাহাজ ও ২০টি বিমান হারিয়ে গেছে এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে।

৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৮। মার্কিন নেভির ফ্লাইট নাইন্টিনের পাঁচটি বিমান বেরিয়েছে প্রশিক্ষণে। ছুটছে মহাসাগরের ওপর দিয়ে। কন্ট্রোল বেসের সঙ্গে নিয়মিত কথা বলছেন মিশন প্রধান চার্লস টেইলর। রেডিওতে হঠাৎ কথা বলতে বলতে থেমে যায় টেইলরের কণ্ঠ। নীরবতা ভর করে রেডিওতে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। কন্ট্রোল রুম থেকে অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সংযোগ স্থাপন আর সম্ভব হয়নি। টেইলর বা তার দলের কেউ আর যোগাযোগ করেননি।

শুরু হয় সার্চ মিশন। সেগুলো উদ্ধারের জন্য পাঠানো হয় আরও দুটি বিমান আর একদল দক্ষ ক্রুকে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ হয়ে ফেরে একটি বিমান। কিন্তু ফেরেনি আরেকটি বিমান। দিনদুপুরে গায়েব! রেডিওর সর্বশেষ সিগন্যাল ট্র্যাক করে জানা যায়, মিয়ামি উপকূলের ওই কুখ্যাত ত্রিভুজ এলাকাতেই হারিয়েছে সব কটি বিমান। এই প্লেন দুর্ঘটনাই ব্যাপক কুখ্যাতি এনে দেয় বারমুডা ট্রায়াঙ্গলকে।

১৮৮১ সাল। এলেন অস্টিন নামের একটা জাহাজ চলছে আটলান্টিকের বুকে। হঠাৎ জাহাজের নাবিকদের চোখে পড়ে একটা পরিত্যক্ত খালি জাহাজ। এলোমেলো ভেসে বেড়াচ্ছে সাগরের বুকে। কৌতূহলী অস্টিনের নাবিকেরা জনশূন্য জাহাজটাকে অনুসরণ করে একসময় ধরেও ফেলেন। হইহই করে সেই জাহাজে নেমে পড়েন অস্টিনের একদল নাবিক। জাহাজে যদি মূল্যবান কিছু মেলে! তাছাড়া জাহাজটাকে ধরে তারা দেশে নিয়ে যেতে চান। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ নেন নাবিকেরা। তারপর দুটো জাহাজ পাশাপাশি চলে নিউইয়র্কের দিকে। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সদ্য পাওয়া জাহাজটা হারিয়ে যায় অস্টিনের নাবিকসহ। পরে সেটাকে আবার খুঁজে পান অস্টিনের নাবিকেরা। কিন্তু তাদের যে দল ওই জাহাজে নেমেছিল, নিয়েছিল এর নিয়ন্ত্রণ, সেই নাবিকের দলটা যেন বেমালুম গায়েব! কী করা উচিত, ভাবেন নাবিকেরা। সাহায্যের মেসেজ পাঠান কন্ট্রোল বেসে। উদ্ধার করতে যায় আরেকটা দল। কিন্তু সেখানে গিয়ে কিছু পায় না রেসকিউ টিমটা। না এল অস্টিন, না অন্য জাহাজটা- একেবারে গায়েব দুটি জাহাজই। এ ঘটনাও ঘটে ওই রহস্যময় ত্রিভুজেই।

আজ অব্দি অনেক গবেষণা হয়েছে এই ট্রায়াঙ্গল সম্পর্কে, সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানীর গবেষণায় উঠে এসেছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আসল রহস্য। তারা বর্ণনা করেছেন, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যের পিছনে রয়েছে হেক্সাগোনাল ক্লাউড অর্থাৎ ষড়ভুজাকৃতি মেঘ। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের এই অংশে ২০ থেকে ৫৫ মাইল জুড়ে ষড়ভুজাকৃতির মেঘের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৭০ মাইল। এই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ুকে বলা হয় 'এয়ার বম্ব'। যা প্রায় ৪৫ ফুট উচ্চতার সামুদ্রিক ঝড় তৈরি করতে পারে। কোনো জাহাজ এই ঝড়ে টিকে থাকতে পারে না। এমনকি, বিমানের পক্ষেও এই তীব্র বাতাসের বেগ সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। এছাড়া এখানকার ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কারণে কম্পাস সঠিকভাবে কাজ করে না বলে মনে করেন একদল বিজ্ঞানী। আবার বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ওই এলাকাটি হারিকেনপ্রবণ বলেও মনে করা হয়।

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড রহস্যে ঘেরা সমুদ্রের এক গভীর গিরিখাদ। আজ থেকে ১ লাখ ২৫ হাজার বছর আগে প্লাইস্টোসিন যুগে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সমুদ্রের নিচে সৃষ্টি হয় অন্তত ১১টি বিশাল খাদ। তারই একটি হলো সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ব-দ্বীপের পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের মধ্যকার এই গভীর খাদটি 'গঙ্গা খাদ' নামেও পরিচিত। এটি সুন্দরবনের দুবলার চর থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। গভীরতম এই উপত্যকার রেকর্ডকৃত আয়তন প্রায় ১৩৪০ মিটার এবং এর গড় গভীরতা প্রায় ১২০০ মিটার। মারিয়ানা ট্রেঞ্চের পর এটিই পৃথিবীর দ্বিতীয় গভীরতম স্থান।

সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি গভীর সমুদ্রখাদ। এর অর্থ, যার কোনো তল নেই। বঙ্গোপসাগরের এই অঞ্চলটির নামকরণের পেছনে রয়েছে একটি রহস্য। ১৮৬৩ সালে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ নিয়ে ভারত থেকে ইংল্যান্ড যাওয়ার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ হয় গ্যাডফ্লাই নামের একটি জাহাজ। যার ওজন ছিল ২১২ টন। এই জাহাজকে খুঁজতে গিয়েই আবিষ্কার হয় তলবিহীন 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড।' এর কোনো তলা নেই বলে স্থানীয় জেলেদের কাছে এটি 'নাইবাম' নামে পরিচিত।

'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' বর্তমানে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি সংরক্ষিত এলাকা। ২০১৪ সালের ২৭শে অক্টোবর এটি প্রতিষ্ঠিত হয় সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে। এ খাদটি বিলুপ্তপ্রায় অনেক প্রাণীর অবাধ বিচরণক্ষেত্র এবং প্রজননকেন্দ্র। সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড -এ ৫ প্রজাতির তিমি ও ৮ প্রজাতির ডলফিনের প্রজনন কেন্দ্র । পুরো বিশ্বে একমাত্র এ খাদটিতে একসাথে ডলফিন, তিমি ও পরপয়েজ পাওয়া যায়। তাছাড়াও এখানে রয়েছে হাতুড়ি মাথার হাঙ্গর, বুবী সিগাল, সবচেয়ে বড়ো ইরাবতী ডলফিন, অক্টোপাসসহ অনেক জানা-অজানা প্রাণীর বাসস্থান।

গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন

প্রাকৃতিক যেসব বিস্ময় মানুষকে যুগে যুগে মুগ্ধ করেছে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তার মধ্যে অন্যতম।

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যে অবস্থিত দীর্ঘ গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এটি পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিখাত। এর দৈর্ঘ্য ২৭৭ মাইল, গভীরতা প্রায় এক মাইল। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। আর গিরিখাতের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে কলোরাডো নদী।

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ১৭ মিলিয়ন বছর আগে। কলোরাডো নদীর পলিমাটি জমে পাথরের মতো শক্ত হয়ে যায়। এই পাথরের ফলে নদীর চলাচল পথে বাঁধা সৃষ্টি হতে থাকে। বর্তমানে এই নদী অনেক খাঁড়াভাবে নিচে নেমে এসেছে। এ কারণে পুরনো নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলেছে। এই পরিবর্তিত নদীপথে তৈরি করেছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন। এই গিরিখাতের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে ঐতিহ্যবাহী কলোরাডো নদী। এই প্রবাহ এখনও চলমান। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের গভীরতা আরো কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে। যা তাকে আরো গ্র্যান্ড করে তুলবে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। প্রাকৃতিক যেসব বিস্ময় মানুষকে যুগে যুগে মুগ্ধ করেছে, গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন তার মাঝে একটি। আর সে কারণে প্রতি বছর পাঁচ মিলিয়নেরও অধিক পর্যটকের উপস্থিতিতে সরগরম থাকে পুরো গিরিখাত।

মেরুজ্যোতি

বিস্তৃত এই পৃথিবীতে বিস্ময়ের অভাব নেই। পাহাড় থেকে শুরু করে সমুদ্র-প্রকৃতির সব উপাদানই যেন প্রতিনিয়ত তাদের চমকপ্রদ খেল দেখিয়ে যাচ্ছে। সেই চমকপ্রদ খেলার অন্যতম একটি হচ্ছে অরোরা বা মেরুজ্যোতি। যা পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে ঘটতে দেখা যায়। উত্তর মেরুতে এটি অরোরা বোরিয়ালিস বা নর্দার্ন লাইটস বা সুমেরুজ্যোতি নামে পরিচিত। আর দক্ষিণে এর নাম অরোরা অস্ট্রালিস বা সাউদার্ন লাইটস বা কুমেরুজ্যোতি। অরোরা হলো আকাশে এক ধরনের প্রাকৃতিক আলোর প্রদর্শনী।

অরোরা নিয়ে প্রাচীনকালে অনেক উপকথা চালু ছিল। অনেকেই বলতেন স্বয়ং ঈশ্বর এই আলোর মালা তৈরি করেন! কেউ আবার বলেন, তাদের পূর্বপুরুষেরা আকাশে নাচানাচি করে তাই আকাশের রং বদলে যায়।

সূর্য আমাদের থেকে প্রায় ৯৩ মিলিয়ন মাইল দূরে অবস্থিত। কিন্তু এর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সৌরঝড়ের ফলে প্লাজমা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। সেটি পৃথিবীতে এসে পৌঁছুলে এগুলো পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ও বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে। সেই কারণেই অণু-পরমাণুর সংঘর্ষে উজ্জ্বল আলোকবৃত্ত তৈরি হয়। ঠিক যেমনটা তৈরি হয় নিয়নের বাতিতে। বেশিরভাগ অরোরাতেই সবুজ ও গোলাপি রং দেখা যায়। কখনও নজরে পড়ে লাল বা বেগুনি রংও। সাধারণত কানাডা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিনল্যান্ড, রাশিয়া, অ্যান্টার্কটিকায় এই রঙের খেলা বা অরোরা দেখা যায়।

স্নেক আইল্যান্ড

ফুটবলের দেশ ব্রাজিল। আর ব্রাজিলের বিশ্বখ্যাত সমুদ্রসৈকত সাও পাওলো। সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ংকর ও রহস্যময় সুন্দর এক দ্বীপ। যে দ্বীপে কোনো মানুষ বাস করে না। কোনো পর্যটক যায় না। যারা যায় তারা সাধারণত আর বেঁচে ফিরে আসে না। কারণ সেখানে গিজগিজ করছে শুধু সাপ আর সাপ। মানুষের পা রাখার জায়গা নেই। যেখানেই পা দেবেন সেখানেই ফণা তুলে আছে তীব্র বিষধর কোনো সাপ।

এই স্নেক আইল্যান্ড বা সর্প দ্বীপের আসল নাম ইলহা দে কুইমাদা গ্র্যান্ডে। বিশ্বের সবচাইতে বিষধর সাপ গোল্ডেন ল্যান্সহেড ভাইপার এই দ্বীপেই বাস করে। চোরা বাজারে এই প্রজাতির একটি সাপের দাম ২৩ লক্ষ টাকা, যার লোভে চোরা শিকারিরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ওই দ্বীপে লুকিয়ে প্রবেশ করে। এই সাপের বিষের তীব্রতা এত বেশি যে, মানুষের মাংস পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে। একবার এক জেলে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল। খাবারের খোঁজে কিছু না জেনেই ওই দ্বীপে প্রবেশ করে সে। তার চোখে পড়েছিল গাছে গাছে ঝুলে থাকা পাকা কলার কাঁদি। কিন্তু পরদিনই তার রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায় দ্বীপের মাটিতে।

সেই থেকে সাধারণ মানুষের ধারণা হয়, ওই দ্বীপে গেলে কেউ আর জীবিত অবস্থায় ফিরে আসে না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখানে প্রতি বর্গমিটারে কমপক্ষে ৫টি সাপ থাকে। সাপের কারণে এই দ্বীপে পাখিদের আনাগোনাও কম। তবে অভিবাসনের সময় পাখিরা এখানে বিশ্রাম নেয়, আর তখনই সাপের শিকারে পরিণত হয় ।

ব্রাজিল সরকার জনসাধারণের জন্য বহুদিন আগেই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে ওই দ্বীপের প্রবেশপথ। দূরগামী সামুদ্রিক জাহাজ যাতে ভুল করেও এই দ্বীপের কাছাকাছি চলে না আসে তার জন্য একদা এখানে একটি লাইট হাউজ নির্মাণ করা হয়েছিল। তার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন নৌ বাহিনীর এক অফিসার (১৯০৯-১৯২০)। শোনা যায়, একদিন জানালার ফাঁক দিয়ে এক বা একাধিক ল্যান্সহেড সাপ ঢুকে ওই অফিসার, তার বউ ও তিন সন্তানকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে। তারপর থেকে আর কাউকে পাঠানো হয়নি ওই দ্বীপে। ব্রাজিল সরকার ওই লাইট হাউজকে স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। ❑

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

গল্প

একরোখা রতন

ধ্রুব নীল

চোখ মেলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল ছেলেটার। একরাশ সাদা। ধবধবে সাদা। যতদূর চোখ যায় ততদূর। মিশমিশে কালো থাকলেও যে কথা, সাদা থাকলেও ব্যাপারটা একই। কিছুই দেখা যাবে না। সময়ের গতিও বোঝা যাচ্ছে না। সেকেন্ড মানে কি? ভুলে গেছে ছেলেটা। এমনকি নিজের নামটাও। ডান হাতটা তুলে আনল চোখ বরাবর। নিজের অস্তিত্ব আছে বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলো কিছুটা।

'গুড মর্নিং। ১..২.. ৩.. ৪...।'

এভাবে পনেরো পর্যন্ত গুনল স্পিকারে ভেসে আসা একটা কণ্ঠ। এরপরই চোখে উজ্জ্বল সাদা আলোটা সয়ে এল। অবাক হলো ছেলেটা। ঠিক তার মতোই সাদা টিশার্ট আর সাদা প্যান্ট পরা কয়েকশ ছেলে দাঁড়িয়ে। হলরুমটার দেয়াল সম্ভবত কেউই দেখছে না। ছেলেটা দেখেই বুঝল বাকি

ছেলেগুলো তারই বয়সী। অদ্ভুত ব্যাপারটা টের পেল বেশ কয়েক সেকেন্ড পর। সামনে থাকা বিভ্রান্ত ছেলেগুলোর চেহারা হুবহু একই রকম।

'হ্যালো রতন।'

আবারও স্পিকারের গলা। কথাটা কাকে বলল লোকটা? রতন কে?

'ওহ! আমিই তো রতন!'

গোটা হলরুমের সমস্ত ছেলে গুঞ্জন করে উঠল। আবার চুপ। রতনের কানে সবার নিঃশ্বাসের শব্দটা শোনাচ্ছে হিস হিস করতে থাকা হাজারটা সাপের মতো। এক পা এগোলো। ধুপধাপ শব্দ। আরও অনেকেই তার মতো করে এক পা এগিয়েছে। পায়ে পায়ে সবাই সবার সামনে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কেউ যাচ্ছে না। সবাই যে যার জায়গাতেই আছে। রতনের মনে হলো সে এক পা আগানোর সঙ্গে সঙ্গে পেছনের মেঝেটাও তার সামনে চলে আসছে।

ছেলেরা সবাই হট্টগোল পাকাল। এ ওর দিকে তাকাল, ও তার দিকে তাকাল। ওরা সবাই ধরে নিয়েছিল যে, সে ছাড়া বাকি সবার চেহারা বুঝি এক। ভুলটা ভাঙতে বেশিক্ষণ লাগল না। হলরুমে সবার চেহারাই এক। রতনও ধরতে পারল বিষয়টা।

'রতন তুমি নিরাপদে আছো। ভয় পেয়ো না। তুমি হারিয়ে যাবে না।'

লোকটা ভয় পেতে বারণ করল কেন? ভয় পাওয়ার কারণ আছে?

রতন ভাবছে, লোকটা শুধু তাকে সম্বোধন করে কথা বলছে কেন? ঘরে তো আরও শয়ে শয়ে ছেলে আছে।

'তোমাকেই বলছি। স্থির হও। এটা একটা সিম্যুলেশন। তুমি মেধাবী ছেলে। তুমি এটা বুঝতে পারবে একটু পরই।'

রতন টের পাচ্ছে তার ভেতর চাপা অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। বাকিরাও ইতস্তত আচরণ করছে। একটু পর আবার সবাই এলোমেলো পায়চারি শুরু করল। এমনটাই যেন স্বাভাবিক। ঠিক যেন ক্লাস পার্টি চলছে। সবাই যে যার মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। রতন স্থির হলো। বাকিরাও স্থির।

'রতন, তোমাকে এখন দেখতে পাচ্ছি না। তবে তোমাকে একটা কাজ দেবো। তুমি কাজটা করলে পুরস্কার পাবে।'

'কী পুরস্কার?'

একযোগে বলল সবাই।

অপরপ্রান্তে নীরবতা। পুরস্কারের বিষয়টা সম্ভবত মিথ্যে। লোকটা বানিয়ে কিছু একটা বলবে হয়ত।

'রতন আমি কিউ-কম্পিউটার কৃবু। আমি আসলে তোমাকে পুরস্কার দিতে পারব না। ব্যাপারটা তোমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য বলেছি।'

রতনের মনে হলো তার একটা কিছু বলা উচিত। সে ভাবছে, সে কিছু বললে বাকিরাও কি একই কথা বলে উঠবে? বাকিদেরও কি মনের মধ্যে একটা কিছু বলার ইচ্ছে তৈরি হয়েছে?

'আমি কোথায়?'

রতন বলল কথাটা। বাকিরা কথা বলেনি।

'তুমি একটা সিম্যুলেশনে আছো। এই মুহূর্তে তোমার অবস্থান আমি জানি না। জানা সম্ভব নয়। আমি এটুকু বলতে পারি যে আমি নিশ্চিত তুমি এখানেই আছো।'

অনেকক্ষণ হলো কম্পিউটার কৃবু আর কথা বলছে না। মনে হলো সে আসলে জানে না রতন কোথায়। রতন কি জানে? রতন এদিক ওদিক তাকাল। এদিক-ওদিক বলতে কোন দিক সেটাও সে বুঝতে পারছে না। তার কাছে মনে হচ্ছে সব দিকই এক দিক।

সাদা হলরুমটায় দেয়াল নেই। দেয়ালগুলোকে মনে হলো অসীম দূরত্বে। রতনের মনে হলো সে আগেও এক অসীমের মাঝেই ছিল, এখনও আছে। পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরজগৎ, তারপর গ্যালাক্সি, গ্যালাক্সির গুচ্ছ, চেনা মহাবিশ্বের শেষ সীমানা, তারপর স্থান-কাল বিহীন অপার এক শূন্যতার সমুদ্র। ঠিক যেন এই ঘরটার মতোই।

ছেলেরা সবাই জড়ো হতে লাগল। তারা ঠিক করল একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলবে। এমনটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু দুটো ছেলে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে হাত মেলাতেই রতন দেখল তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ এবং অদ্ভুত দৃশ্য। ছেলে দুটো হাত মেলাতেই এক হয়ে গেল। মানে দুম করে দুটো থেকে একটা ছেলে হয়ে গেল।

এরপর? এরপর সেই ছেলেটাও নিজেকে আবিষ্কার করল নতুন করে। যেন সে একটু আগে একজনই ছিল। রতন চমকে গেল। সেও কি এভাবে অন্যের মাঝে হারিয়ে যেতে পারে? ওর ঠিক সামনেই আরো তিনটা ছেলে কথা বলছিল। মুহূর্তেই তিনজন নেই হয়ে গেল। এভাবে একে একে সবকটা ছেলে মিলে যেতে যেতে শেষে রইল একজন। সে এবার তাকালো রতনের দিকে।

একরাশ আতঙ্ক চেপে ধরেছে রতনের মনে। ঠিক করেছে ওই ছেলের সঙ্গে কথাই বলবে না। ছেলেটা তার দিকে এগিয়ে আসতেই রতন ছুটে গেল এক দিকে। কোন দিকে? দিক তো সব একই রকম লাগছে। কখনো সামনে, কখনো পেছনে। রতনের মনে হলো সে যে ছেলেটার হাত থেকে বাঁচতে বিপরীত দিকে ছুটল, ছেলেটা আসলে সে দিকেই ছিল। মানে সাপ দেখে কেউ উলটো দিকে ছুটতে গিয়ে আবার সেই সাপের মুখেই পড়ল, ব্যাপারটা এমন।

'রতন, তোমার পায়ের নিচে মেঝেতে তাকাও। তুমি কি কোনো সংখ্যা দেখতে পাচ্ছো?' স্পিকারে ভেসে এল কৃবুর গলা।

'শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য সাত দুই নয়...।'

'হয়েছে। এর মানে সিম্যুলেশন ঠিকঠাক আছে। তুমিও ঠিক আছো।'

'আমি কোথায় আছি?'

'এখানেই কোথাও। আমরা তা জানি না। তবে তুমি আছো।'

'তোমরা কারা?'

'আমি কৃবু। আ.. আমার সঙ্গে বিজ্ঞানী। ইয়ে..তিনি তোমার নাম দিয়েছেন রতন।'

'বাকিরা কারা?'

উত্তর দিলো না কৃবু। মনে হলো সে রতনকে আর দ্বিধায় ফেলতে চায় না।

আচমকা ধাক্কা খেল রতন। সর্বশেষ যে ছেলেটা ছিল সে-ই ধাক্কাটা দিয়েছে। ধাক্কার পর দুজনই সরে গেল। ডান দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে রতনকে দেখল ছেলেটা। রতনও তাকে দেখল বাম পাশে ঘাড় বাঁকা করে।

'তোমার নাম রতন?'

'হ্যাঁ, তুমি?'

'আমি নতর।'

'এ আবার কেমন নাম?'

'তোমার নামটাও অদ্ভুত। আমার নামের উলটো করলে রতন হয়।'

রতন মাথা চুলকানোর জন্য ডান হাত উপরে তুলল। সঙ্গে সঙ্গে নতর তুলল বাম হাত। রতনের মনে হলো সে একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যা করছে নতরও হুবহু তা করছে। তবে উলটোভাবে করছে। রতন বাম পা তুলে লাথি দেওয়ার ভঙ্গি করল, নতর তুলল ডান পা।

রতন দিলো ছুট। ছুটতে ছুটতে নিজেকে আবিষ্কার করল শুরুর জায়গাতেই। মেঝেতে দেখল। আগের সেই সংখ্যাটাই- দশমিক শূন্য শূন্য সাত দুই...। সংখ্যাটার মানে কী?

বুঝিয়ে দিলো কৃবু। 'এটা একটা অনুপাত রতন। একটু আগে তোমার সঙ্গে যার ধাক্কা লাগল তার সঙ্গে তোমার একটা জোড়া বেঁধেছে। আর সংখ্যাটাকে ওই ধাক্কাধাক্কির শক্তি বলতে পারো। এটা ঠিক থাকলে সব ঠিক।'

রতন মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝলেও এটা নিশ্চিত যে তাকে এই অদ্ভুত ঘর থেকে বের হতে হবে। ওদিকে নতরের দেখা পাচ্ছে না। কোথায় হারাল কে জানে। আচমকা রতনের বাম হাত চলে গেল মাথায়। চুলকাতে লাগল। কেন একাজ করল? জানে না। আশপাশে আর কেউ নেই। ধপধপে সাদা এক মহাবিশ্বে সে একা। নতর থাকলেও হতো। কথাবার্তা বলা যেত।

এমন সময় দেখল নতর আসছে তার দিকে। সে তার ডান হাত দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছে।

'ও, এই তবে ঘটনা। তুমি যা করবে আমি তার উলটোটা করব?' বলল নতর।

'আমিও একই ব্যাপার টের পাচ্ছি। তুমি বাম হাত দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছ বলেই তো আমি ডান হাত দিয়ে মাথা চুলকাচ্ছি।'

ধন্ধে পড়ল রতন। তাদের মধ্যে কে আগে মাথা চুলকাতে শুরু করল ভেবে পেল না। সম্ভবত দুজন একসঙ্গেই।

'এখান থেকে বের হতে হবে আমাকে।'

'বিজ্ঞানীকে বলে দেখো। সে পারবে মনে হয়। আমরা একা একা বের হতে পারব না।'

'আমরা মানে, আমি বের হতে চাই শুধু। তুমি আমার ছায়া। তুমি কেন বের হবে! তুমি আসল না। আমি আসল।'

'হা হা হা।'

নতর হেসে উঠল। হাসিটা অসহ্য লাগল রতনের। নতরও নিশ্চয়ই একই কথা ভাবছে। রতন চেঁচিয়ে বলল, 'আমাকে এখান থেকে বের করো!'

অদৃশ্য স্পিকারে মৃদু ফিসফিস শব্দ শুনল রতন। কৃবু নামের কম্পিউটারটা কীসের হিসাব করছে এত? ওই বিজ্ঞানীই বা কে? রতনের মনে পড়ল সে অনেক বিজ্ঞানীকে চেনে। তার এও মনে পড়ছে যে সে নিজেও বিজ্ঞানীর চেয়ে কম জানে না। কী যেন একটা পরীক্ষার কথা মনে পড়ল তার। কে করছে সেই পরীক্ষা? পরীক্ষার ফল কী হবে? উত্তর পেল না।

'দুঃখিত রতন। আমরা তোমাকে বের করতে পারব না। তোমার বের হওয়ার পথ তোমাকেই বের করতে হবে।'

কৃবুর কথায় মাথায় বাজ পড়ল রতনের। মেজাজটাও বিগড়ে গেল। মেঝের সংখ্যাটাই কি সব নষ্টের গোড়া? কৃবু তো বলল সংখ্যাটা ঠিক আছে মানে সব ঠিকঠাক। সব ঠিকঠাক থাকলে সে বের হতে পারবে না এই অদ্ভুত সাদা ঘর থেকে। সংখ্যাটা বদলে দিলে কেমন হয়?

'না রতন তুমি তা করতে পারো না। আমি করতে দেবো না। কারণ আমি নতর। আমি তোমার উলটোটা করব। এটাই আমার কাজ। প্রকৃতি এটাই ঠিক করে দিয়েছে। তুমি যেমন আমি তার উলটোটা। আমরা দুজন থাকলে সব ব্যালেন্স থাকবে। সংখ্যাটাও বদলাতে পারবে না।'

'তোমার ব্যালেন্সের নিকুচি করি আমি। আমি বের হবো!'

'আমি তা হতে দেবো না। তুমি যে কারণে বের হতে চাও আমি তার উলটো কারণে বের হতে চাই না।'

'আমাদের একজনকে বের হতে হবে। তা না হলে...।'

'তা না হলে কী?'

'তা না হলে আমরা দুজন শূন্য হয়ে যাব বুঝলে?'

শুরু হলো কুস্তি। রতন বনাম নতর। কেউ কারো সঙ্গে পেরে উঠছে না সহজে। আচমকা কুস্তি থামিয়ে রতন বলল, 'আমি যা করব তুমি তো তার উলটোটাই করবে তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আর তা যদি করতে না পারো?'

'তবে আমরা আর জোড় থাকব না। আমাদের একজন বের হয়ে যাব এই ঘর থেকে। কিন্তু সেটা তো হবে না। তুমি আমার সঙ্গে কখনই পেরে উঠবে না। আমিও পেরে উঠব না। আমাদের কুস্তি আজীবন চলতেই থাকবে।'

রতন মেঝেতে তাকাল। নতরের সঙ্গে পেরে উঠবে না বুঝতে পেরেছে। তবে বুদ্ধি একটা পেয়েছে। অদ্ভুত সেই সংখ্যাটার দিকে তাকাল। সংখ্যাটার শেষ অঙ্কটা হলো ৮। রতন জোরসে ঘষে সেটা মুছে লিখে দিলো ৯। আর তাতেই ভীষণভাবে দুলে উঠল দেয়াল বিহীন সাদা ঘরটা। ভেঙেচুরে যেতে লাগল সব।

নতরের দিকে তাকিয়ে হাসল রতন। বলল, 'আমাদের মধ্যে একজন জেগে উঠবে এখন।'

নতর বলল, 'কে জেগে উঠবে? আমি না তুমি?'

রতন বলল, 'আমি জানি না। তুমি যে ব্যালেন্সের কথা বলেছিলে, সেটা ভেঙে দিয়েছি। নতুন যে সংখ্যাটা তৈরি হলো তাতেই আমাদের একজন জেগে উঠবে।'

'হুম। ঠিক!'

চোখ মেললেন বিজ্ঞানী সাইদুল করিম রতন। হাত বাড়িয়ে চশমাটা পরে নিলেন। কম্পিউটার কৃবুর রেকর্ড বলছে এক সেকেন্ডের দশ হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ সময় তিনি সিম্যুলেশনে ছিলেন। কত ক্ষুদ্র সময়, অথচ মনে হলো অন্ততকাল। ওয়েভ ফাংশন নষ্ট হতেই ঘুম ভেঙেছে বিজ্ঞানী রতনের। উঠেই মাথা দুলিয়ে বলতে লাগলেন, 'বুঝলিরে কৃবু! সব বুঝতে পেরেছি। একটা একরোখা কণার গোঁয়ার্তুমির কারণেই ঘটেছিল বিগ ব্যাং।' ❑

প্রাবন্ধিক ও শিশুসাহিত্যিক

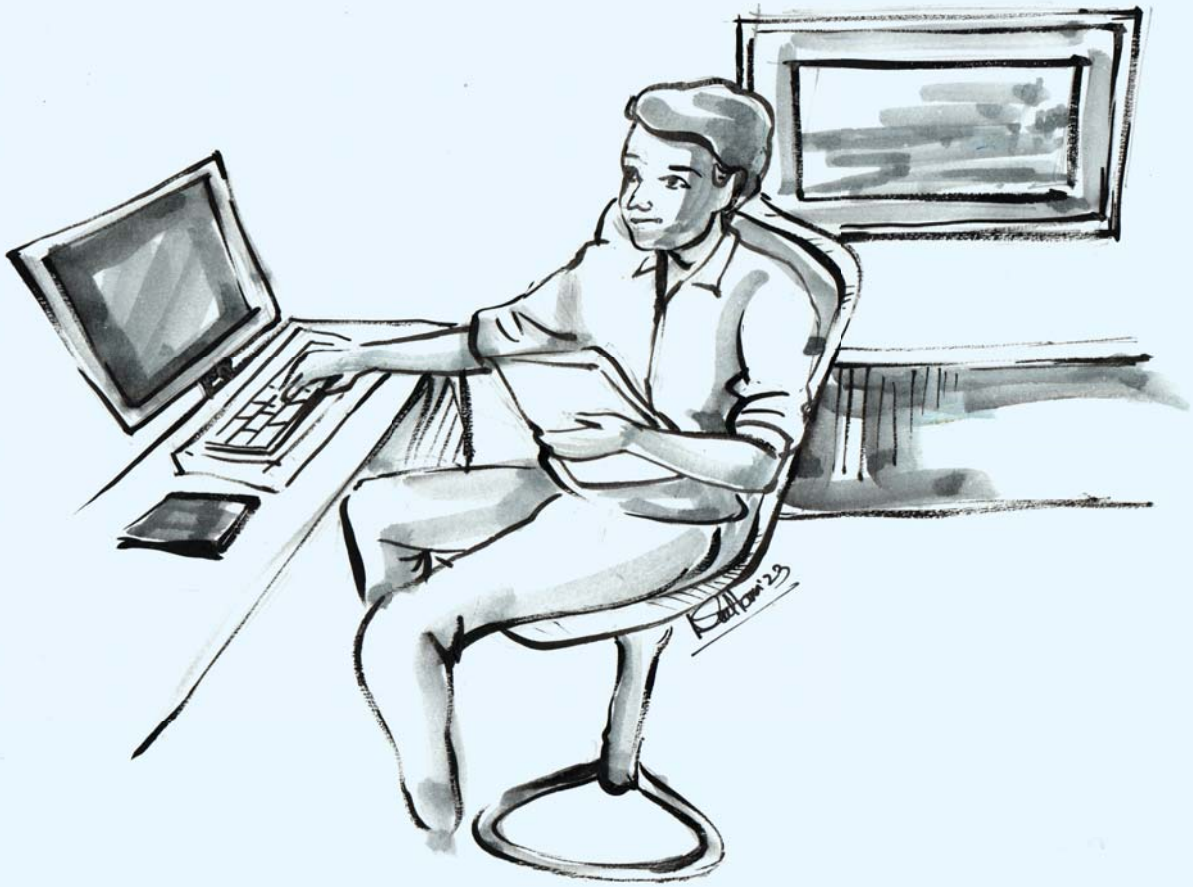

গল্প

খবর আছে! খবর!!

নাসরীন মুস্তাফা

সব খবর তো আর পত্রপত্রিকা-টেলিভিশন-বেতারসহ সব মাধ্যমে আসে না। এই যেমন এই খবরটা কেউ পড়েনি, দেখেনি, শোনেওনি। তুমিও পড়োনি, দেখোনি, এমনকি শোনোওনি। খবরটা হচ্ছে...

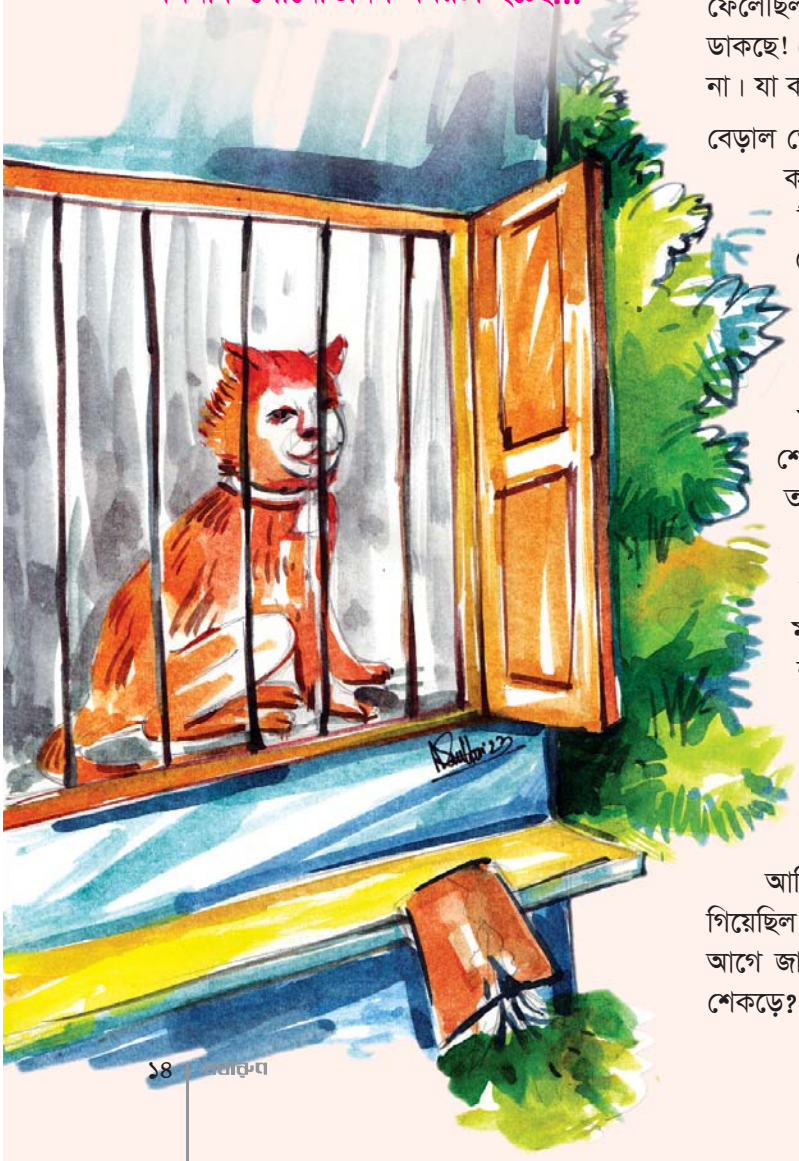

পৃথিবীর এক যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্টের বাড়ির জানালায় রাখা ছিল গাছসহ টব। লাফ দিয়ে টবে রাখা গাছটাকে ফেলে দিল প্রেসিডেন্টের আদরের বেড়াল। গাছটা জানালার ওপাশে বাগানের মাটিতে পড়ল। টব গুঁড়িয়ে মাটি ছড়িয়ে গাছের শেকড় বাগানের মাটির ছোঁয়া পেল। গাছটা বাগানের মাটিতে শেকড় ঢুকিয়ে দিল। বাগানের সবকটা গাছের শেকড়ে পাঠিয়ে দিল জরুরি খবর। প্রেসিডেন্ট যত রকমের ঝামেলার পরিকল্পনা করেছে, সব শুনেছে গাছটা। কিছু বলেনি। এতদিন শেকড়ে জমিয়ে রেখেছিল। সুযোগ পেতেই ঝড় তুলে দিল মাটির নিচে।

বেড়ালটা কি এমনি এমনি লাফ দিয়ে টবটাকে নিচে ফেলেছিল? ক্যামন গুল্লু গুল্লু ভাব করে ম্যাও ম্যাও ডাকছে! যেন ওর কোনো দোষ নেই। ও কিছু জানে না। যা করেছে, না বুঝে করেছে।

বেড়াল তো এমন ভাব করবেই। গাছটাই যে এসব করতে বলেছিল ওকে, তা তো বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। গাছের কথা বেড়াল শোনে এবং বোঝে। বেড়ালের কথা গাছ শোনে-বোঝে কিন্তু প্রেসিডেন্ট শুনলেও বোঝে না। প্রেসিডেন্ট কেন, কোনো মানুষ কি বোঝে? আর গাছের কথা কোনো মানুষ কেন, প্রেসিডেন্ট-রাজা-বাদশারাও শোনে না। শুনতে পায় না। তুমিও পাও না, তাই না?

কেন পাও না? পাও না কারণ, আল্ট্রাসনিক শব্দতরঙ্গ তৈরি করে গাছ কথা বলে। মানুষের কান এই মাপের তরঙ্গ ধরতে পারে না। তাই শুনতে পারার অনুভূতি পায় না মানুষের মস্তিষ্ক। সেকারণে মানুষ মনে করে, গাছ কথা বলতে পারে না।

বাঙালি বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু গাছের করা আল্ট্রাসনিক শব্দতরঙ্গ ধরার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু যন্ত্রটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। এসব নিয়ে পরে আরো কথা বলা যাবে। আগে জানি, গাছটা কী খবর ছড়িয়ে দিল শেকড়ে শেকড়ে?

খবরটা হচ্ছে...

পৃথিবীর সেই যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট পৃথিবীর আরো কয়েকজন যুদ্ধবাজকে দলে টেনেছে। এরা কেউ প্রেসিডেন্ট, কেউ রাজনৈতিক নেতা, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ অভিনেতা, গান গায়-কবিতা লেখে। এরা ঠিক করেছে পৃথিবী জুড়ে তুমুল যুদ্ধ লাগিয়ে দেবে। যুদ্ধ যুগে যুগে বহু লেগেছে পৃথিবীতে। তবে এবার এরা লাগাবে মহা মহা মহাযুদ্ধ। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ লেগে পড়বে যুদ্ধে। পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটিতে হবে যুদ্ধ।

মহাযুদ্ধে এদের লাভ কী?

লাভ তো নয়, মহা লাভ। এরা যুদ্ধের নানা রকমের অস্ত্র বানাবে, বিক্রি করবে, সম্পদ লুট করবে। যুদ্ধের পক্ষে কথা বলবে। যুদ্ধের পক্ষে কবিতা লিখবে, গান গাইবে। তখন পৃথিবীর প্রত্যেকে বাধ্য হবে এদের কথা শুনতে, মানতে ও এদের কাছে মাথা নত করতে। এদের পকেটে থাকবে সবচেয়ে বেশি টাকা। এদের মনে থাকবে সবচেয়ে বেশি আনন্দ। বুঝতেই পারছ, তখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি শক্তি এদের হাতেই থাকবে।

আনন্দে ওরা ওদের হলুদ দাঁতগুলো দেখিয়ে গ্রুপ ছবি তুলল। সেই ছবিসহ খবর এল পত্রপত্রিকা-টেলিভিশন-বেতারসহ সব মাধ্যমে। সেসব খবরের শিরোনাম হলো এরকম– আমরা শান্তি চাই... আমরাই যুদ্ধ থামাবো...আমরা আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজিয়ে ঢাকঢোল-ঘুঙুর বাজিয়ে হ্যান করেগা ত্যান করেগা...ইত্যাদি।

এসব কিন্তু ডাহা মিথ্যে কথা! টবের সেই গাছটা সত্যি খবরটা জানিয়ে দিয়েছে এর মধ্যে। ফলে সত্যি খবর পেয়ে গেল সব গাছ। গাছরা জানিয়ে দিল পশুপাখি-মাছসহ সব প্রাণীদের। মানুষেরা শুনতে পায় না গাছের কথা। তাই বোকা মানুষেরা তখনো ভাবছে, মানুষের মতো বুদ্ধি কারো নেই...মানুষের অনেক শক্তি...মানুষ আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজিয়ে ঢাকঢোল-ঘুঙুর বাজিয়ে হ্যান করেগা ত্যান করেগা...ইত্যাদি।

দুই

সত্যি খবর পেয়ে গেছে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটাও। লাল মিয়া চেয়ারম্যানের ছাগলও। তিনদিন ধরে কেবলি ডাকছে। ভ্যা ভ্যা ভ্যা। কাঁঠাল গাছটা পর্যন্ত পাতাসহ ডাল বাড়িয়ে দিয়ে বলেছে, খা বাপ্! খা।

না! ভ্যা! ভ্যা! না!

না খেয়ে লাভ কী? মানুষের জন্য বড়ো মায়া তোর, তাই না?

ভ্যা! হ্যাঁ! হ্যাঁ! ভ্যা!

মানুষ ঝামেলা করে। যুদ্ধ বাঁধায়। অন্যকে কষ্ট দেয়। গাছ কাটে। পানির কল ছেড়ে রাখে, বন্ধ করার কথা ভুলে যায়। দিনের বেলায় বাতি জ্বালিয়ে বিদ্যুতের অপচয় করে। গাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বের করে। বাতাস দূষিত করে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাড়িয়ে দিয়েছে, অক্সিজেন গ্যাস কমিয়েছে।

তা ভ্যা! ভ্যা তা!

জানি তো! তোর শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তোর জন্য গাছ হয়ে আমি কত চেষ্টা করি বাতাসে অক্সিজেন বাড়াতে। আমি একা আর কত করব? আগে এখানে সাতটা গাছ ছিল। লাল মিয়া চেয়ারম্যান কাটতে কাটতে ছয়টাকেই কেটে ফেলেছে। এখন আমার উপর সব চাপ। যত পারি অক্সিজেন গ্যাস তৈরি করি। আমাকে কেটে ফেললে এটুকুও তো পাবি না।

ভ্যা তা! তা ভ্যা!

পৃথিবীর পরিবেশের যা অবস্থা করেছে মানুষ! রাগে-দুঃখে মনে হয় পৃথিবী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাই। চলে যাওয়ার উপায় নেই। পৃথিবীর মাটিতে আমাদের শেকড় জড়ানো। আমরা মানুষের মতো নই। আসলে মানুষ ছাড়া আমরা অন্য পশুপাখি-মাছ-গাছ, কেউই মানুষের মতো নই। আমরা সবাই পৃথিবীকে ভালোবাসি।

ভ্যা! ভ্যা!

আর তাই পৃথিবীকে বিপদে পড়তে দেবো না আমরা। আর তাই, চরম শাস্তি দিতে হবে মানুষকে।

ভ্যা! না! ভ্যা! হ্যাঁ!

ছাগলটা মাথা তুলে দেখে, আকাশে অনেক অনেক পাখি। সবার চ্যাঁচামেচিতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে পিঁপড়ে, ইঁদুরের মতো প্রাণীরা। ওরাও জোর গলায় আওয়াজ তুলছে। ইঁদুরের কিচকিচ, বুনো ঘুঘু পাখির ডাহুম হুম্, হাতির গ্রোওওওওওওও, কুকুরের ঘেউ ঘেউ, বেড়ালের মিউমিউ কানে লাগছে।

সব পশুপাখি চিৎকার করছে। বলতে চাইছে কিছু। কেউ বলতে চাইছে, চরম শাস্তি দিতে হবে মানুষকে। কেউ আবার মানুষকে সাবধান করে বলছে, বিপদ থেকে বাঁচতে কিছু করো।

লাভ হচ্ছে না। যাদের বোঝা দরকার ওরা কী বলতে চাইছে, তারা তা বুঝতে পারছে না। এই যেমন, লাল মিয়া চেয়ারম্যান দলবল নিয়ে পুকুরে মাছ ধরছিল। মাছরা খই ফোটার মতো পানি থেকে লাফিয়ে উপরে উঠছে, আবার পানিতে পড়ছে। কাঁঠাল গাছ আর ছাগলটা মাছদের কথা শুনতে পেলেও মানুষরা পারল না। ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ শুনে আর

মাছদের কাণ্ড কারবার দেখে চেয়ারম্যান ভাবে আর বলে, কোরিয়ানরা ব্যাঙ খায়। এই চ্যাঁচানো ব্যাঙ কোরিয়াতে বিক্রি করে অনেক টাকা কামাবো।

আরো আছে। চেয়ারম্যান লাফানো মাছের ভিডিও করে ফেসবুকে ছেড়ে দেয়। যত বেশি মানুষ এই ভিডিও দেখবে, তত টাকা আয় হবে। খুশিতে চেয়ারম্যান গান গায়, টাকা ভালো তাই টাকাই চাই। ওরে আমার টাকা ভাই!

ভিডিওটা ভাইরাল হয়নি। কেননা, অন্য আরেকটা ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে ঝড়ের বেগে। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন ওই ভিডিওটাই দেখছে। যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট, তার যুদ্ধবাজ সাঙ্গপাঙ্গরাও দেখছে।

কী আছে ওই ভিডিওতে? কী ছিল ওই ভিডিওতে?

তিন

টবের গাছটার শেকড় থেকে ছড়িয়ে পড়া সত্যি খবর পৌঁছে গেল গাছরাজার শেকড়ে। গাছরাজা হচ্ছে পৃথিবীর সব গাছের রাজা। ওর বয়স পৃথিবীর সব গাছের চেয়ে বেশি। প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে।

মানুষ এই গাছের নাম দিয়েছে মেথুসালেহ। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার মাটির নিচে বিশাল শেকড় ছড়িয়ে বেঁচে আছে। তবে মেথুসালেহ যে সব গাছদের রাজা, এ খবর মানুষ জানে না। মানুষ এও জানে না, সব গাছরা বিপদে পড়লে রাজার শেকড়ে খবর পাঠায়। মানুষ গাছ কাটছে, খবর পাচ্ছে রাজা। গাছের বনে আগুন লাগছে, রাজা জানছে। মানুষ যুদ্ধ করছে, বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস-বোমা বারুদের গন্ধ। সব খবর পায় রাজা। মানুষ মহাযুদ্ধ শুরু করতে যাচ্ছে জেনে রাজা বুঝল, কিছু একটা করতে হবে। মহাযুদ্ধে পৃথিবীর পরিবেশের খুব ক্ষতি হবে। বাঁচবে না পশুপাখি-গাছসহ প্রাণীরা। সবার জন্যই কিছু একটা করতে হবে।

মেথুসালেহ আল্ট্রাসনিক শব্দতরঙ্গ তৈরি করে জানিয়ে গেল পৃথিবীর বিপদের খব্র। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে কোনো আল্ট্রাসনিক শব্দতরঙ্গ তৈরি হয় কি না জানতে যন্ত্র বসিয়েছিলেন স্যাটেলাইটে। সেই যন্ত্রে ধরা পড়ল মেথুসালেহ'র কথা। নাকি গান? কথা হোক আর গান, কিছুই কিন্তু বুঝতে পারলেন না বিজ্ঞানীরা।

বুঝলটা কারা?

মেথুসালেহ'র কথা নাকি গান পৌঁছে গেল বহু বহু দূরের এক গ্রহে। সেখানে বাস করে মেথুসালেহ'র পূর্বপুরুষ। তারা গাছ, কিন্তু দিব্যি চলতে পারে। দিব্যি মহাকাশযান নিয়ে চলে এল পৃথিবীতে। দিব্যি পৃথিবীর মানুষদের ধরে নিয়ে চলে গেল। ভিডিওতে দিব্যি চলতে পারা ভিনগ্রহী গাছদের নেতা বলছিল, পৃথিবীকে ধ্বংস করার শাস্তি পেতে হবে মানুষকে। আগেও এভাবে শাস্তি পেয়েছে মানুষ। বহু বহু দূরের গ্রহেই ছিল মানুষের আসল বাড়ি। সেখানকার পরিবেশ নষ্ট করায় ওদেরকে এনে ফেলা হয়েছিল পৃথিবীতে। পৃথিবীর পরিবেশ নষ্ট করায় আবারও শাস্তি পেতে হলো মানুষকে।

কী সেই শাস্তি? ভাবতেও ভয় পায় ছাগলটা। কেবল ডাকে, ভ্যা! ওরে বাবা! ভ্যা! বাবা ওরে!

চার

পৃথিবী থেকে বহু বহু দূরের আরেক গ্রহ। পুরোপুরি না হলেও অনেক মিল আছে পৃথিবীর সাথে। সেখানে দাস হিসেবে আছে মানুষরা। লাল মিয়া চেয়ারম্যানও আছে। আসার সময় পকেটে ছিল বাংলাদেশের টাকা, আমেরিকান টাকা ডলার আর দক্ষিণ কোরিয়ার টাকা ওউন। এগুলো পুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। নইলে কাঁচা মাংস খেতে হবে বেচারাকে।

আগুন ধরার আগেই মাথায় চাটি খেল বেচারা। মানুষ ছাড়া আর সব পশুপাখি-গাছ যে যার মতো চাটি মারছে। চাটি মারতে মারতে বুঝিয়ে দিল, আগুন ধরিয়ে পরিবেশের ক্ষতি করা যাবে না। হয় কাঁচা মাংস খা। নইলে সবুজ ঘাস-লতাপাতা-ফলমূল খা।

এসব খেতে খেতে যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা পাগল হয়ে গেছে। যা করছে, তা বলতে গেলে আমিও পাগল হয়ে যাব। শুনতে গেলে তোমরাও পাগল হবে। তাই থাক ওসব। ❑

শিশুসাহিত্যিক

বিস্ময়কর লেক ও ঝরনা

নুসরাত জাহান

হট স্প্রিং লেক

বন্ধুরা, আমাদের এই রহস্যময় পৃথিবীতে রহস্যের কোনো সীমা নেই। ইতিহাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে রহস্যের নানা উপাদান। আজ তোমাদের বলছি তেমনি একটি আশ্চর্য সুন্দর প্রস্রবণের গল্প। হট স্প্রিং লেক বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো উষ্ণ প্রস্রবণ।

এ-ও যেন পৃথিবীর এক আশ্চর্য। মাটির বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ফুটন্ত জল। সেই জলেই তৈরি হয়েছে বিশাল এই হ্রদ। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, ঠিক যেন একটা কড়াই। তার ভিতরে ফুটে চলেছে জল। মাটির নিচে কে যেন জ্বালিয়ে রেখেছে অদৃশ্য আগুন। সেই আগুনেই টগবগিয়ে ফুটছে হ্রদের জল। উঠে আসছে ধোঁয়া।

নিউজিল্যান্ডের রটোরুয়ার ওয়াইমাহু ভলক্যানিক রিফ্‌ট ভ্যালিতে রয়েছে এই হ্রদ। প্রায় ৩৮ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে এই হ্রদ প্রায় ৬ মিটার পর্যন্ত গভীর। তবে তার ভিতর রয়েছে বেশ কিছু ভেন্টস, যা ২০ মিটার পর্যন্ত গভীর হতে পারে। এই ফ্রাইং প্যান লেক কিন্তু বেশ বিপদজনকও। না, শুধু উত্তপ্ত জলের জন্যই নয়। নানা ধরনের অ্যাসিড প্রবাহিত হচ্ছে হ্রদের গভীরে। যার জন্যই অনবরত ফুটে ওই জলের হ্রদ। জলের পি এইচ মাত্রা এখানে ৩.৫। মানে ব্যবহারের পক্ষে বেশ অ্যাসিডিক এই জল।

১৮৮৬ সালে নিউজিল্যান্ডে জেগে উঠেছিল মাউন্ট তারাওয়ারা আগ্নেয়াগিরি। এখনো পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো অগ্ন্যুৎপাতের ঘটনা ছিল এটিই। যার জেরে মৃত্যু হয়েছিল কয়েক'শ মানুষের। ওই অগ্ন্যুৎপাতের ফলেই তৈরি হয়েছিল বিশালাকার এক জ্বালামুখ বা গর্তের। তার পরে ওভাবেই পড়েছিল দীর্ঘদিন। ১৩ বছর পর সেই মুখ থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল একটি উষ্ণ প্রস্রবণ যার জল এখনও ফুটে চলেছে সমান তালে। সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক আশ্চর্য উত্তপ্ত কড়াইয়ের মতো দেখতে এই হট স্পিং লেক।

কটন ক্যাসল

বিশ্বে যতগুলো মুসলিম দেশ আছে তাদের মধ্যে অন্যতম তুরস্ক। এক সময় তুরস্ক পুরো পৃথিবীকে শাসন করত। সবচেয়ে ঝকঝকে আকাশ নাকি দেখা যায় এই তুরস্কে। এই দেশের রয়েছে গৌরবজ্জ্বল সব ইতিহাস।

বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জানাবো সেই তুরস্কেরই এক বিস্ময়কর জায়গার কথা। এটিকে বলা হয় তুলার প্রাসাদ। কেন্দ্রীয় আনাতোলিয়ায় অবস্থিত ক্যাপাডোসিয়া সুপরিচিত হয়েছে এর অস্বাভাবিক আকৃতির পাহাড়ের সমন্বয়ে গঠিত রূপকথার রাজ্যের মতো সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য।

একে কিন্তু অনেকে চেনেন গরম পানির ঝরনা হিসেবে। পৃথিবীর একমাত্র স্থান এটি যেখানে প্রাকৃতিকভাবেই ঝরনার পানি গরম। তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিমের রাজ্য দেনিজালি। এই দেনিজালি রাজ্যেই দেশটির সবচেয়ে বড়ো পর্যটন আকর্ষণ পামুক্কালের অবস্থান। তুর্কি শব্দ পামুক্কালের অর্থ কটন ক্যাসল বা তুলার প্রাসাদ। কারণ এটিকে দেখলে তেমনটাই মনে হয়। যেন তুলা দিয়ে বানানো এক বিশাল প্রাসাদ।

পামুক্কালের পাহাড়ি উপত্যকাটি খনিজ লবণে সমৃদ্ধ। এই লবণগুলোই জমাট বেঁধে চুনাপাথরের তুলার প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। আর এই প্রাসাদ জুড়ে আছে অনেক গরম পানির ঝরনা। সেসব ঝরনার পানি জমে জমে এই পাহাড়ি উপত্যকায় কতগুলো পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই এই পুকুরগুলোও খনিজ লবণে ভর্তি। আর সে কারণে এখানকার পানিও বেশ উষ্ণ ও আরামদায়ক। শুধু যে পুকুরগুলোতে গোসলই করা যায় তা-ই নয়। ওই সাদা লবণগুলো গায়ে মেখে ভূতও সাজা যায়। প্রচুর খনিজ লবণের কারণে জায়গাটি কেবল সুন্দর আর দর্শনীয়ই নয়, বেশ স্বাস্থ্যকরও।

ব্লাড ফলস

ব্লাড ফলস অ্যান্টার্কটিকার সাদা বরফের মাঝে রক্তের ঝরনা। ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন জানি বিস্ময় জাগে। বিশাল বরফে মোড়ানো পাহাড় থেকে ঝরনা দিয়ে পানির বদলে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে লাল রক্ত। আরো অবাক করা ব্যাপার

হলো হিমাঙ্কের নিচে যেখানে সবকিছু জমে যাওয়ার কথা সেখানে লাল রক্তের মতো পানির ধারা প্রবাহমান। কেন? বন্ধুরা, এসো জানা যাক যুগ যুগ ধরে চলে আসা অ্যান্টার্কটিকার এই রহস্যের কথা।

১৯১১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ভূতাত্ত্বিক গ্রিফিথ টেলর প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন এই রক্ত ঝরনাটি। এটি মূলত আয়রণ অক্সাইড মিশ্রিত লবণাক্ত পানির উপত্যকা যা পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার টমাস গ্লোসিয়া থেকে প্রবাহিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের গবেষণা মতো এই লাল রক্তের পানির উৎস মূলত অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি আর খনিজ লোহার মিশ্রণ যা বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে লাল রং ধারণ করে। বিষয়টা অনেকটা এরকম যে লোহাতে মরিচা ধরলে যেমন লাল রং হয়ে যায় ঠিক একইভাবে এই পানি লাল রং ধারণ করে।

আলাস্কা ফেয়ার ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই রক্ত ঝরনা প্রবাহিত হচ্ছে প্রায় ১৫ লক্ষ বছর ধরে যা আসলেই বিস্ময়কর। যারা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তারা ঘুরে আসতে পারো অ্যান্টার্কটিকার সাদা বরফে ঢাকা প্রান্তর এই রহস্য ঘেরা রক্তের ঝরনাটি।

ডেড সি, জর্ডান

সাগর বলা হলেও এটি মূলত একটি হ্রদ যার সর্বোচ্চ গভীরতা ৩০৪ মিটার। এর পৃষ্ঠ ভাগ ও তীরদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪২৯ মিটার নিচে অবস্থিত। তাই একে ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিম্নভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়।

এখন জানা যাক এই বিশাল লবণাক্ত জলভূমিকে কেন সবাই মৃত সাগর বলে। এর পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ প্রায় ৩৪.২% যা সমুদ্রের পানির চেয়ে ৮.৬ গুণ বেশি লবণাক্ত। অত্যধিক লবণাক্ততার কারণে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিবেশে জলজ প্রাণীরা বসবাস ও জীবনধারণ করতে পারে না। এই সাগরে কোনো প্রাণীর বাস নেই বললেই চলে। এ কারণে এই জলভূমির নাম মৃত সাগর। যতই চেষ্টা করবে ডুবে যাওয়ার কিন্তু ভেসেই থাকবে। কারণ পানির লবণাক্ততা এত বেশি হওয়ার কারণে পানির প্লবতা অনেক

বেশি। মৃত সাগরের পানির প্লবতা এতই বেশি যে বস্তুর ওজন অনেক বেশি হলেও বস্তুকে ডুবানো বেশ কঠিন।

ডেড সি-তে কোনো মাছ নেই, কারণ এই সাগরের পানিতে কোনো মাছ বাস করতে পারে না। এই সাগরের পানিতে কোনো উদ্ভিদ বা মাছ আসতে পারে না বলেই এই সাগরকে ডেড সি বা মৃত সাগর বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে মৃত সাগর অঞ্চলটি চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণাস্থল হয়ে উঠেছে।

আনজিকুনি লেক

এটি কানাডার এক প্রত্যন্ত এস্কিমোদের গ্রাম। নাম আনজিকুনি। গ্রামের নামকরণ করা পাশে অবস্থিত আনজিকুনি লেকের নামানুসারে। লেকে রয়েছে বিপুল পরিমাণে পাইক এবং ট্রাউট মাছের সমাহার। আর এই আনজিকুনি গ্রামটি কানাডার বিরল এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের কাজান নদীর তীরে অবস্থিত। পৃথিবীর প্রতিদিনকার নিয়মের মতোই এখানে সূর্য উঠে আর অস্ত যায়।

লেকের পেছনে পাইন গাছের অবাধ সারি আর মানুষের কোলাহল। আনজিকুনি গ্রামের মানুষ এভাবেই পার করে যাচ্ছিল তাদের দৈনন্দিন যাপিত জীবন। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন ঘনিয়ে আসে এক লোমহর্ষক ঘটনা।

ঘটনার সূত্রপাত সেই নভেম্বর মাসেই। জো লেবেলে নামের একজন আনজিকুনি গ্রামে আসে। লেবেলে পেশায় শিকারি। প্রত্যেকবারের মতো বছরের রসদ আর মাংস নিয়ে লেবেলে এসে ঢুকে তার প্রিয় আনজিকুনি গ্রামে শিকারের সন্ধানে। কিন্তু গ্রামে ঢুকেই অদ্ভুত এক নিঃসঙ্গতার খরাস্রোত লেবেলের শিরাতে বয়ে গেল। মনে হচ্ছে সমস্ত গ্রাম যেন এক মৃত আত্মা।

লেবেলে গ্রামের যত ভিতরে যায় তার গায়ে কাঁটা দিতে শুরু করে। সে গ্রামের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। এস্কিমোদের এই গ্রামগুলোতে অতিথিদের জন্য সব সময় কিছু বিশ্রামাগার খোলা থাকে। লেবেলে ঠিক এসে দাঁড়ায় গ্রামের এক বিশ্রামখানার সামনে। তার মনে চূড়ান্তভাবে ধরা পড়ে যে গ্রামে ভয়াবহ কিছু হয়েছে।

বিশ্রামখানার আশপাশে মানুষের চিহ্নমাত্র নেই। তাহলে মানুষগুলো গেল কোথায়? মানুষ ছাড়া পুরো গ্রামের সবকিছু ঠিক আগের মতোই ছিল। লেবেলে

আশপাশে অনেক অনুসন্ধান করেও কোনো নমুনা পেলো না।

এই জনমানবশূন্যতা পুরো পৃথিবীর জন্য বয়ে আনল এক রহস্যের আভাস। লেবেলে আর দেরি না করেই ছুট লাগায় টেলিগ্রাফ অফিসে। যখন পুলিশ ঘটনাস্থলে পোঁছে তখন আরও বেশ কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়। যা ইঙ্গিত করে যে মানুষের নিখোঁজ হওয়ার সাথে রহস্যময় প্রকৃতির সংযোগ ছিল।

অন্তত একটি গোটা গ্রামের এমন অদ্ভুত নিখোঁজ হওয়া সমস্ত ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করার মতো। এমনকি যদি কেউ উপজাতির উপর আক্রমণ করত পুলিশ লোকদের দেহাবশেষ বা সংঘর্ষের চিহ্ন খুঁজে পেতো। কিন্তু সেরকম কিছুই পাওয়া যায়নি পুরো গ্রামের নাড়িনক্ষত্র খুঁজে। এভাবেই ইতিহাসে কাজান নদীর পাশের এই শান্তশিষ্ট এস্কিমো গ্রামটি 'মৃতদের আত্মা'র গ্রাম বলে পরিচিতি পায়।

মিশরের গিজার গ্রেট পিরামিড

পিরামিড পৃথিবীর একটি আশ্চর্য নিদর্শন এবং সবচেয়ে প্রাচীন কীর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। মিশরের ভিতরে ও বাইরে আরো পিরামিড থাকলেও গিজা অঞ্চলের তিন পিরামিডই জগদবিখ্যাত। মিশরের ফারাওরা পিরামিডগুলো তৈরি করেছিলেন। ধারণা করা হয়, প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর পূর্বে এ পিরামিডগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

পিরামিড তৈরি হয়েছিল পাথর কেটে, পাথরের টুকরো দিয়ে। পিরামিড বানাতে তেইশ লক্ষ টুকরো পাথরের প্রয়োজন হয়েছিল। সবচেয়ে বড়ো পিরামিড বানাতে ১ লক্ষ লোকের ২০ বছর সময় লেগেছিল। ব্যয় হয়েছিল প্রচুর অর্থের। অনন্ত জীবন লাভের আশায় ফারাওরা পিরামিডগুলো তৈরি করেছিলেন।

ফারাওদের বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পরে তাদের শরীর যদি পচে যায় কিংবা কোনো আঘাতে নষ্ট হয় তাহলে তারা পরলোকে অনন্ত জীবন পাবে না। তাই মৃতদেহকে 'মমি' বানিয়ে পিরামিডের ভিতরে রাখা হতো যাতে পিরামিডের ভিতরে ঢুকে কেউ 'মমি'কে ছুঁতেও না পারে। কিন্তু তাদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি। কারণ এরমধ্যে মানুষ মমিকে স্পর্শ করতে পেরেছে এবং তা স্থানান্তরিত করে জাদুঘরে রেখেও দিয়েছে। ❑

সম্পাদক, নবারুণ

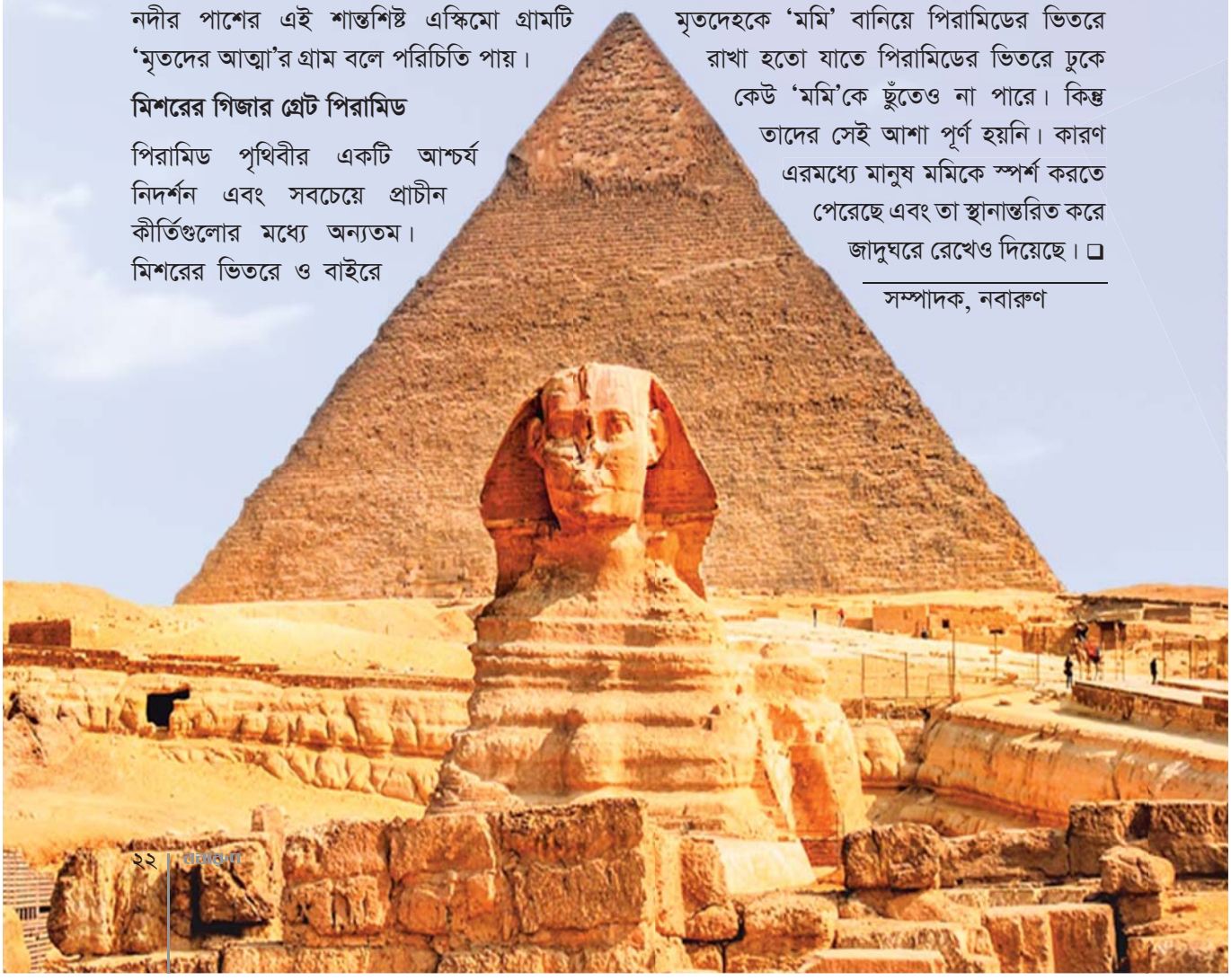

গল্প

বয়স কমে যায় যে গ্রহে

আশরাফ পিন্টু

–বাবা, তোমার সঙ্গে আমাকেও ভ্রমণে নিয়ে যাও।

–এখন তোমার দাদুর খোঁজে বেরুচ্ছি। বড়ো হও অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে যাব। ছেলে স্বননের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেন আশরাফ খান।

সাত বছরের ছেলে স্বনন ও স্ত্রী রূপালি বেগমকে রেখে আশরাফ খান নভোযানে চড়ে বসেন।

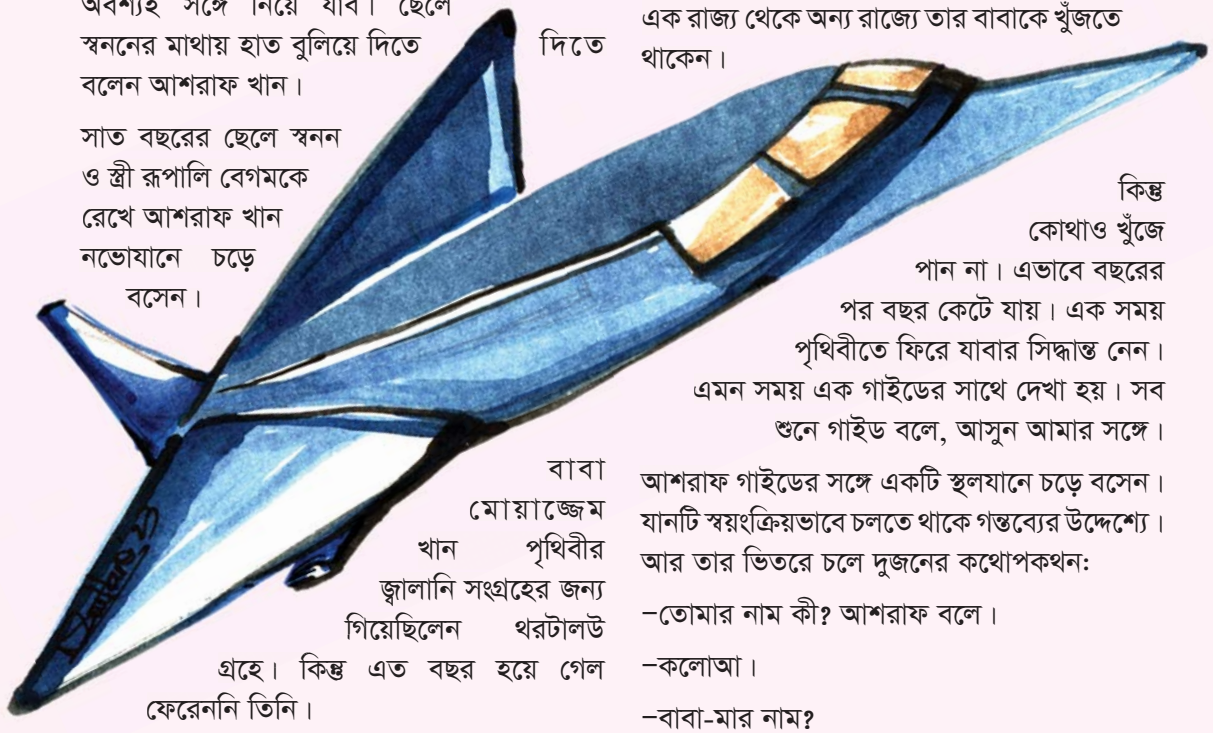

বাবা মোয়াজ্জেম খান পৃথিবীর জ্বালানি সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন থরটালউ গ্রহে। কিন্তু এত বছর হয়ে গেল ফেরেননি তিনি।

সুপারসনিক নভোযান অঐ-১৯৭১ দ্রুতগতিতে ছুটে চলছে 'থরটালউ' গ্রহের উদ্দেশ্যে। স্বয়ংক্রিয় নভোযানটি হঠাৎ একটি বিবরে ঢুকে পড়ে। আশরাফ খান মনে করেছিলেন এটি কৃষ্ণবিবর (ব্লাকহোল), এই বুঝি প্রাণ চলে যায়। কিন্তু না, এটি কৃষ্ণবিবর নয়, এটি মহাশূন্যের শর্টকাট একটি রাস্তা।

এক সময় অঐ-১৯৭১ 'থরটালউ' গ্রহে এসে অবতরণ করে। গ্রহটি যেমন খনিজ সম্পদে ভরপুর তেমনি সুন্দর। আশরাফ একটি তথ্যকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যান। তথ্যকেন্দ্রে যিনি বসে রয়েছেন তিনি অনেকটা মানুষের মতো দেখতে। তবে কিছুটা ভিন্নতাও রয়েছে। যেমন তার কান দুটো লম্বা ও খাঁড়া। চোখ দুটো মানুষের মতো হলেও নাকে শুধু দুটো ফুটো রয়েছে। আশরাফ খানকে দেখে উঠে দাঁড়াতেই দেখা যায় তার প্যান্টের পিছন দিক দিয়ে একটি লেজও বের হয়ে আছে।

আশরাফ খান জীবটিকে সবকিছু খুলে বলেন। কিন্তু কোনো সঠিক তথ্য দিতে পারে না। ভুল করে তো অন্য রাজ্যে এসে পড়েনি। আশরাফ 'থরটালউ' গ্রহের এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে তার বাবাকে খুঁজতে থাকেন।

কিন্তু কোথাও খুঁজে পান না। এভাবে বছরের পর বছর কেটে যায়। এক সময় পৃথিবীতে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। এমন সময় এক গাইডের সাথে দেখা হয়। সব শুনে গাইড বলে, আসুন আমার সঙ্গে।

আশরাফ গাইডের সঙ্গে একটি স্থলযানে চড়ে বসেন। যানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে থাকে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। আর তার ভিতরে চলে দুজনের কথোপকথন:

–তোমার নাম কী? আশরাফ বলে।

–কলোআ।

–বাবা-মার নাম?

–আমার কোনো বাবা-মা নেই।

–বলো কী? তুমি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ?

–না জনাব। সত্যি আমাদের কোনো বাবা-মা নেই।

–তাহলে জন্ম হলো কীভাবে?

–ডিএনএ থেকে, ক্লোন পদ্ধতির মাধ্যমে।

–ক্লোন পদ্ধতিতে তো একজনের চেহারার সঙ্গে আরেকজনের চেহারার মিল থাকে, তোমাদের নেই কেন?

–এটি আপনাদের ক্লোন পদ্ধতির মতো নয়।

–তোমাদের মৃত্যু আছে?

–জীব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। তবে আমাদের মৃত্যু অন্যরকম।

–কেমন?

–আমরা যখন ডিএনএ রূপান্তরিত হই তখন আমরা মৃত্যুবরণ করি। তবে যেসব ডিএনএ সজিব থাকে সেগুলো থেকে আবার বংশবৃদ্ধি হয়।

–বুঝলাম না। লাশ কী করা হয়?

–লাশ তো থাকে না। আমাদের শেষ পরিণতি হয় ডিএনএ-তে।

–ভালো করে বুঝিয়ে বলো। আশরাফ খান কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

–তোমাদের গ্রহে জন্ম-মৃত্যু কীভাবে হয় জানি না। আমাদের জন্ম হয় ল্যাবরেটরিতে; তবে ওখানে আমরা শিশু নই, পূর্ণাঙ্গ বা পরিণত বয়সে জন্মগ্রহণ করি

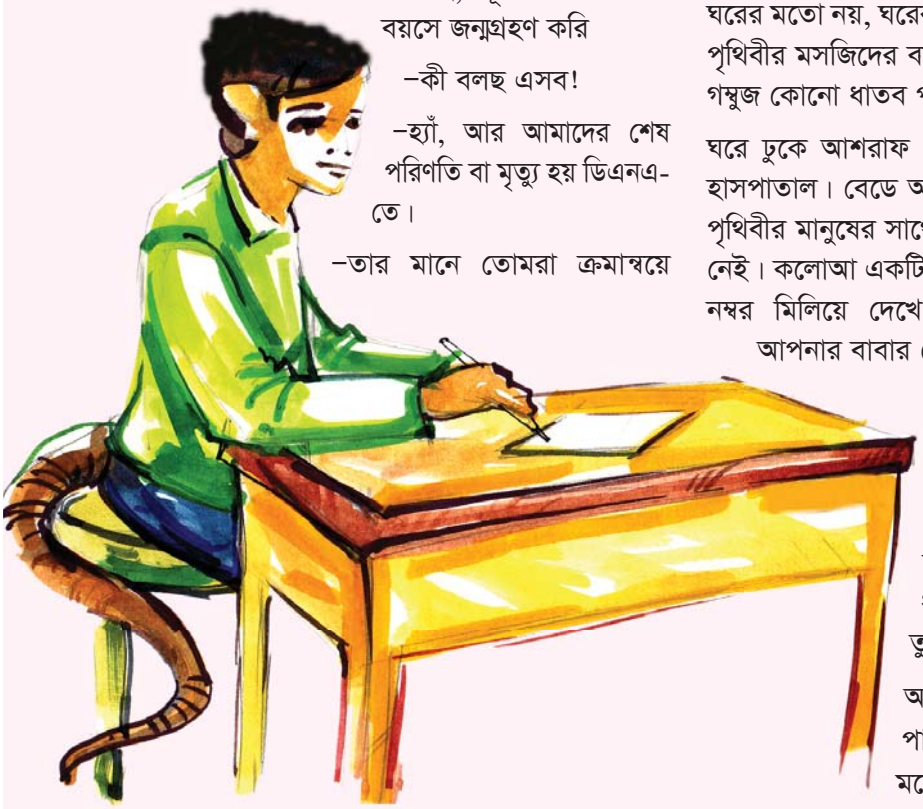

–কী বলছ এসব!

–হ্যাঁ, আর আমাদের শেষ পরিণতি বা মৃত্যু হয় ডিএনএ-তে।

–তার মানে তোমরা ক্রমান্বয়ে বড়ো থেকে ছোটো হতে থাকো। ঠিক আমাদের উলটো। কিন্তু এমন কেন হয়?

–এটাই এ গ্রহের (প্রকৃতির) নিয়ম। কারণ আমাদের সূর্য পশ্চিমদিকে উদিত হয়ে এবং পূর্বদিকে অস্ত যায়; আর ঘোরেও তোমাদের পৃথিবীর উল্টো দিকে অর্থাৎ ডানাবর্তে।

গাইড কলোআর কথা শুনে আশরাফ খান তাজ্জব হয়ে যান। ও অনেক গ্রহে ঘুরেছে কিন্তু এমন আজব অদ্ভুত গ্রহ এই প্রথম দেখল। এমন সময় যানটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে থেমে যায়। ওরা দুজন যান থেকে নেমে আরেকটি তথ্যকেন্দ্রের দিকে যায়। তথ্যকেন্দ্রের কর্মকর্তা একটি চিরকুট তুলে দেয় গাইডের হাতে। চিরকুটটি হাতে নিয়ে আশরাফের দিকে তাকিয়ে বলে, আর একটু এগুলেই আপনার বাবার সাক্ষাৎ মিলবে।

দুজন কিছু পথ হেঁটে এসে একটি বড়ো ধরনের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ঘরটি পৃথিবীর কোনো ঘরের মতো নয়, ঘরের ছাদটি ডিম্বাকৃতির, অনেকটা পৃথিবীর মসজিদের বড়ো গম্বুজের মতো। দেয়াল ও গম্বুজ কোনো ধাতব পদার্থের তৈরি।

ঘরে ঢুকে আশরাফ খানের মনে হয় এটা কোনো হাসপাতাল। বেডে অনেক রোগী শুয়ে আছে। তবে পৃথিবীর মানুষের সাথে কারো চেহারার কোনো মিল নেই। কলোআ একটি বেডের কাছে থেমে চিরকুটের নম্বর মিলিয়ে দেখে। আশরাফকে বলে, এটাই আপনার বাবার বেড।

আশরাফ দেখে বেডে একজন কিশোর বসে আছে। তাকে দেখে পৃথিবীর মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। এমন সময় কিশোরটি আশরাফকে জড়িয়ে ধরে উৎফুল্ল হয়ে বলে, বাবা তুই এখানে?

আশরাফ খান বুঝে উঠতে পারেন না কিশোরটি কে? ওর মনোভাব বুঝতে পেরে কিশোরটি

বলে, আশরাফ তুই আমাকে চিনতে পারছিস না, আমি তোর বাবা মোয়াজ্জেম খান।

–কিন্তু তোমার বয়স এত কমে গেল কীভাবে?

–তা তো জানি না। অ্যাক্সিডেন্ট হবার পর থেকেই এখানে পড়ে আছি। কীভাবে হলো বুঝতে পারছি না।

বাবার বয়স কমে যাওয়ার ব্যাপারে হঠাৎ কলোআর কথা মনে পড়ে আশরাফ খানের। এ গ্রহের নিয়মানুসারেই বাবার বয়স কমে গেছে। এতে অবাক হবার কিছু নেই। এরপর কলোআর দিকে তাকিয়ে বলেন, চলো উঠি এখন।

বাড়িতে পৌঁছে আশরাফ খান খুশিতে ছেলে স্বননকে ডাকতে থাকে। দরজা খুলে দেয় এক মধ্যবয়সি ব্যক্তি। আশরাফ খান তাকে দেখে বলে, স্বনন কই?

মধ্যবয়সি ব্যক্তিটি আশরাফ খানকে চিনতে পেরে বলে, বাবা আমিই স্বনন।

–তুই এত বয়স্ক হয়ে গেছিস, তোকে দেখে তো আমার চেয়েও বেশি বয়স মনে হচ্ছে।

–হ্যাঁ বাবা, তোমার বয়সও তো কিছুটা কমে গেছে মনে হচ্ছে।

স্বননের এবার চোখ পড়ে বাবার পাশে দাঁড়ানো কিশোরের দিকে। বলে, এ কে বাবা?

–ও তোর দাদু।

–দাদু! এ ছেলে আমার দাদু হয় কী করে?

–উনি যে গ্রহে ছিলেন, ওই গ্রহের ওটাই নিয়ম; যেখানে বয়স কমে যায়, পৃথিবীর মতো বাড়ে না।

–তাই বুঝি তোমার বয়সও কমে গেছে।

–হ্যাঁ তাই। চল, এবার ভিতরে যাই।

আশরাফ খান, তার বাবা মোয়াজ্জেম খান ও ছেলে স্বনন তিন পুরুষ একসঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। ❑

শিশুসাহিত্যিক

বিস্ময় জগত

আলম শামস

সুন্দর আকাশ মধুর বাতাস
সূর্যের আলো ভরা
রাতের বেলা তারার মেলা
বিস্ময় জগত গড়া।

বাগিচায় ফুল সুবাস বিপুল
করে বিমোহিত
পাখিদের গান সুর ভাসমান
বিশ্ব আনন্দিত।

আকাশের চাঁদ দেখার হয় সাধ
অপরূপ সৃষ্টি
নদীর কলকল দু'চোখ ছলছল
দিশেহারা দৃষ্টি।

রহস্যময়

আশিষ কুমার দত্ত

রহস্যময় পৃথিবীতে আছে
রহস্যভেদ করা তথ্য-উপাত্ত
তাই নিয়ে হয়েছে
কত শত কবিতা আর গদ্য।

পাহাড়, পর্বত, নদীনালা
আছে কত রহস্যের উপাদান
তা থেকে জানব মোরা
অজানাকে জানার জ্ঞান।

গল্প

iæfvi UvBg †gwkb

তাপস কুমার দত্ত

স্কুল থেকে ফিরেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল রুভা। সে আজকে দারুণ একটা বুদ্ধি আবিষ্কার করেছে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই সে মাকে প্রশ্ন করল– 'বাবা কোথায়?'

'কোথায় আবার! অফিসে।'

'কখন আসবে?'

'কেন তুই জানিস না? প্রতিদিন যখন আসে তখনই আসবে।'

রুভা স্কুল থেকে ফেরার আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাবা বাড়ি ফেরেন। বুদ্ধিটা বাবার সঙ্গে শেয়ার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না রুভা। একবার দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা বাজে। বাবা আসবেন সাড়ে পাঁচটায়। রুভা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। তাই দেখে মা এসে শক্ত একটা ধমক দিলেন। রুভা অবাক হয়ে বলল, 'বকছো কেন?'

'স্কুলের জামা ছাড়িসনি কেন?'

'বাহ। এটা আমার দোষ? আমি একা জামা ছাড়তে পারি? তুমি হেল্প করছ না কেন?'

'ধিরিঙ্গি মেয়ে। ফাইভে পড়ো। এখনো একা একা কিছুই শেখোনি। শুধু শিখেছো মুখে মুখে তর্ক করতে।'

'বাবা এখনো আসছে না কেন?'

'বাবার কি আসার সময় হয়েছে? এক কথা বারবার বলছিস কেন? বাবাকে কী দরকার?'

'সিক্রেট। তোমাকে বলা যাবে না। তুমি অবশ্য বললেও বুঝবে না।'

রুভার হাত-মুখ ধোয়াতে ধোয়াতে মা বললেন, 'আমি শুভকে বলে দেব এবার যেন আমেরিকা থেকে তোর জন্য কিছু না আনে।'

'শুভ মামার কিছু আনতেও হবে না। আমিই শুভ মামার জন্য সারপ্রাইজ নিয়ে যাব।'

'কী সারপ্রাইজ?'

'উহু। তোমাকে বলা যাবে না মা। তোমার পেট পাতলা, শুভ মামাকে বলে দেবে।'

রুভার মুখ মোছাতে মোছাতে মা বললেন, 'আমার অত টাইম নেই তোর ফাও কথা শোনার।'

রুভার ছোটো মামা আমেরিকার কালোমাজোতে ফিজিক্সে পড়ে ওয়েস্টার্ন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে। মামা গতকাল রুভাকে ফোন করে বলেছে, এবার আর ক্রিসমাসের ছুটিতে বাংলাদেশে আসতে পারবে না। রুভা অনেক দিন ধরে ছোটো মামার অপেক্ষায় ছিল। ছোটো মামা বলেছিল. এবারের শীতের ছুটি সে জমিয়ে ঘুরবে। বিশাল বিশাল পরিকল্পনা।

শ্রীমঙ্গল, বান্দরবান, সেন্টমার্টিনের ছেঁড়া দ্বীপ, সুন্দরবন এমনকি তাদের দেশের বাড়ি ফরিদপুরের পদ্মার চরেও এক রাত থাকবে। সেদিন থাকবে জোছনা রাত। কোথাও কোনো আলো থাকবে না। ওরা জেলেদের নৌকায় বসে মাছ ধরা দেখবে আর আকাশের তারা গুনবে।

এমন ট্যুর প্ল্যান রুভার একদম পছন্দ হয়নি। গ্রাম ওর অসহ্য লাগে। ওর ভালো লাগে শপিং মল, এসি রুমের হাইফাই হোটেল, সেখানে সুইমিংপুল থাকবে। শপিং মলে গিয়ে পিৎজা খাবে। কিংবা গ্রিল মুরগি, নান রুটি, সঙ্গে কোক। সিনেপ্লেক্সে কোনো একটা থ্রিডি সিনেমা দেখবে। তারপর বাড়িতে এসে তার ট্যাবে বন্ধুদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করবে সারাদিনের এক্সাইটিং ঘটনাগুলো। দুয়েকটা রিল কিংবা শর্টস ভিডিও বানাবে, তারপর সেটা আপলোড করবে ইউটিউবে। রাতে ঠিকমতো ঘুম হবে না। কজন তার ভিডিও দেখল, কটা লাইক পড়ল, কজন সাবস্ক্রাইব করল–এগুলো সে সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই দেখে নেবে। এটাই গত তিন মাসে রুভার সারাদিনের কমন রুটিন।

তার এই ভার্চুয়াল অ্যাডিকশন দেখে বাবার কপালে ঋষিদের মতো ছাপ পড়ে যাচ্ছে। মা হঠাৎ হঠাৎ রেগে যাচ্ছেন, রুভার সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করছেন। রুভার বাবা-মায়ের মুখে এসব কথা শুনে শুভ মামা বলল, 'এ তো ভয়াবহ নেশা! চেয়ে কম ভয়ংকর নয় এই নেশা!' তারপর শুভ মামা গতকাল রুভাকে খুব কঠোর মুখ করে বলেছে, রুভা যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টার বেশি ট্যাব দেখে, তাহলে সে আর কখনো রুভার কাছে আসবে না। রুভার জন্য কোনো উপহারও কিনবে না। আর এইবারের ক্রিসমাসের ছুটিতে বাংলাদেশ আসার সে কোনো চেষ্টাই করবে না। সব ভ্রমণ-পরিকল্পনা সে তখনই বাতিল করল।

সব শুনে রুভার মন খারাপ হলো বটে, কিন্তু ট্যাবের নেশা কি এত সহজে ছাড়া যায়? রুভা দর কষাকষি শুরু করল–'মামা প্লিজ আসো, আমি তোমার কথা শুনব। এক ঘণ্টা না, দু-ঘণ্টা ট্যাব দেখতে দাও। প্লিজ প্লিজ প্লিজ।'

শুভ মামা বলল. 'এক মিনিট বাড়াতে পারি। মোট এক ঘণ্টা এক মিনিট।'

রুভার চিৎকার করে বলল, 'ইইই! ঠিক আছে এক ঘণ্টা পঞ্চাশ মিনিট।'

'ঠিক আছে এক ঘণ্টা পাঁচ মিনিট। কিন্তু শর্ত আছে. কোনো শর্টস, রিল বানিয়ে ইউটিউবে আপলোড করা যাবে না। বারবার ইউটিউবে ঢুকে লাইক-ফলোয়ার গোনা যাবে না। ইউটিউবে বাচ্চাদের গানের ভিডিও আর হোয়াটসঅ্যাপে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে শুধু।'

রুভা বাধ্য হয়ে তা-ই মানল। তবে সেও একটা শর্ত দিলো। তাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া যাবে না কিছুতেই। গতবার সে থাইল্যান্ডের ফুকেট আর পাতায়া ঘুরতে গেছিল। এবার তাকে আমেরিকা নিয়ে যেতে হবে। নিদেন পক্ষে মালদ্বীপে তাকে নিয়ে যেতেই হবে।

এসব ভাবতে ভাবতে কলিং বেল বেজে উঠল। বাবা ঘরে ঢুকে ব্যাগ রাখার আগেই রুভা বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাবা। তোমার সাথে আমার জরুরি কথা আছে। তুমি আমাকে আগে এক মিনিট সময় দাও প্লিজ।'

'আমি জামাকাপড় ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে আসি?'

'না। এখনই শুনতে হবে।'

মা রান্নাঘর থেকে এসে চিৎকার করে বললেন, 'বাবাকে ফ্রেশ হতে দে।'

মায়ের ধমক খেয়ে রুভার মুখ কালো হয়ে গেল। বাবা চেয়ার টেনে বসে বললেন, 'ঠিক আছে মা বলো।'

'শোনো বাবা। তোমাকে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করতে হবে। পারবে তো?'

'হেলিকপ্টার! চেষ্টা করতে পারি।'

'চেষ্টা না। হেলিকপ্টার তোমাকে ভাড়া করতেই হবে। হেলিকপ্টারে করে খুব সহজে আমেরিকা যাবার দারুণ একটি বুদ্ধি আবিষ্কার করেছি। বুদ্ধিটা অবশ্য আমার না, আমার এক বন্ধুর। আজকে বিজ্ঞান ক্লাসে স্যার বলল, পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খায়। এটা নিয়ে আমরা অনেক মজার

মজার প্ল্যান করলাম। তখনই আইডিয়াটা আমাদের মাথায় এল।'

'কী আইডিয়া?'

'শোনো, শুভ মামা আমেরিকায় থাকে ঠিক আমাদের নিচের দিকে। আমাদের যখন রাত ওদের তখন দিন। এখন আমরা একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করব। তারপর সেই হেলিকপ্টার দিয়ে আকাশের উপরে উঠে বারো ঘণ্টা ভেসে থাকব। ততক্ষণ পৃথিবী ঘুরতে থাকবে। ঘুরতে ঘুরতে আমেরিকার কাছে যখন চলে আসবে তখন আমরা নিচে নেমে আসব। ব্যাস! আমেরিকায় পৌঁছে যাব!'

'ওয়াও! দারুণ আইডিয়া তো!'

'আমি কি এই আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পেতে পারি?'

'দেখা যাক। পেতেও পারো।'

মা রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু শুনছিলেন। তারপর বাবার ওপর রেগে বললেন, 'মেয়ে যা বলে তাতেই তোল্লাই দাও। ও এখন ফাইভে পড়ে। এখনো গোমুর্খ রাখবে? ওকে বিজ্ঞানটা বুঝিয়ে দাও।'

রুভা হতাশ গলায় বলল, 'মা তুমি সব কিছু নেগেটিভ ভাবে নাও কেন বলো তো? বাবা তো বলল এটা দারুণ আইডিয়া।'

'বাবা তো বলবেই। মিথ্যা আশ্বাসে হলেও মেয়ের কাছে মহান হতে হবে না!'

বাবা দেখলেন ব্যাপারটা জটিল হয়ে যাচ্ছে। রুভাকে কোলে নিয়ে বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা হলো, পৃথিবীর তো একটা বায়ুমণ্ডল আছে, তাই না মা। পৃথিবী বায়ুমণ্ডলকে সঙ্গে নিয়েই ঘোরে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সঙ্গে লেগে থাকে। এখন তুমি যদি বায়ুমণ্ডলের ভারি অংশ পার করে অতি হালকা অংশে চলে যাও, যেখানে কম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রয়েছে; তাহলে তুমি অত উচুঁতে গিয়ে পৃথিবীর গতি থেকে অনেকটা মুক্তি পাবে। সেটা ধরো পৃথিবীর উপরে কয়েকশো কিলোমিটার। অত উঁচুতে তো হেলিকপ্টার উঠতে পারবে না মা। রকেট লাগবে।'

'রকেট!' রুভা একটু হতাশ হয়ে গেল।

দুই.

ক্রিসমাসের ছুটিতে শুভ মামা ঢাকায় এবার একটা বিস্ময়কর গিফট নিয়ে এল।

হেলমেটের মতো জিনিসটা বের করে শুভ মামা বলল, 'এটা দিয়ে আমরা পৃথিবীর অতীতে চলে যেতে পারব।'

রুভা অবাক হয়ে বলল, 'জিনিসটা কী মামা?'

'টাইম মেশিন।'

'টাইম মেশিন! আমি নাম শুনেছি। ওয়াও! কী দারুণ ব্যাপার! এটা আবিষ্কার হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। আমেরিকায় কয়েকটা তৈরি করা হয়েছে। অনেক ঝামেলা করে তোর জন্য একটা কিনে এনেছি।'

'দারুণ। তুমি কী কিউট মামা।'

রুভা তখনই মাথায় পড়তে চাইল। মামা বলল, 'দাঁড়া আগে সেটিংস করি।'

সেটিংয়ের পর শুভ মামা রুভার মাথায় হেলমেটটা পরিয়ে দিলো। তারপর ধারাভাষ্য দিতে লাগল। বলল, 'আমরা এখন জুরাসিক যুগে।'

রুভা দেখল কয়েকটি ডাইনোসর ওদের দিকে তেড়ে আসছে। তাড়াতাড়ি সুইচ চাপ দিতেই ওরা পৌঁছে গেল আজ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। পৃথিবীর মানুষ তখন পাহাড়ের গুহায় বসবাস করে। তেমনি একটি গুহার কাছে গিয়ে রুভা দেখল–অন্ধকার রাতে আকাশে কোটি কোটি তারা ঝিকমিক করছে। কী অপূর্ব! মনে হচ্ছে ওরা যেন পরিষ্কার আকাশের নিচে বিশুদ্ধ একটা জগতে ভাসছে!

শুভ মামা বলল, 'ঐ দেখ তারাপুঞ্জের উত্তরে ধ্রুবতারার পাশে একটা ধূমকেতু উড়ছে।'

রুভা দেখল, ঐ ধূমকেতু তাই দেখে শত শত মানুষ পাহাড়ের কোলে চিৎকার করছে।

রুভা বলল, 'ওরা চিৎকার করছে কেন মামা।'

'কমেট দেখে ওরা ভয় পেয়েছে। ওরা মনে করছে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'চলো আমরাও পালিয়ে যাই।'

‘চল। আমরা হাজার বছর আগের বাংলাদেশের পল্লিগ্রামে ফিরে যাই।’

টাইম মেশিনের সুইচ হাজার বছর অতীতে এনে লোকেশনটা বাংলাদেশ সিলেক্ট করে দেওয়া হলো। রুভা দেখল ওরা এখন একটা অপূর্ব সুন্দর গ্রামে পৌঁছে গেছে। একজন কৃষক বলদ দিয়ে চাষ করছে। চারদিকে সবুজ গাছগাছালি। মাটির চিলতে রাস্তা। ছনের বাড়ি। নদীর কূলে বসে একজন রাখাল বাঁশি বাজাচ্ছে। হঠাৎ রাখালের জলতেষ্টা পেল, সে নদীতে গিয়ে আজলা ভরে জল পান করল। রুভা বলল, এ মা! ওর তো অসুখ করবে!

মামা বলল, ‘না রে, এই নদনদীতে কোনো দূষণ নেই।’

রাখাল আবার নদীর কূলে বটতলায় বসে বাঁশি বাজাতে লাগল। দূরে গরু চড়ে বেড়াচ্ছে। কী অপূর্ব ঝিরিঝিরি বাতাস! কার্তিকের হিমহিম হাওয়া।

‘কী রে খাবি কখন?’ মায়ের চিৎকার শুনে রুভার যেন সম্বিত ফিরল। মাথা থেকে তাড়াতাড়ি টাইম মেশিন খুলে ফেলল।

খেতে বসে রুভা বলল, ‘মামা আমি পদ্মার চরে যাব। গ্রাম দেখব। নিয়ে যাবে তো?’

মা অবাক হয়ে বললেন, ‘সূর্য কী আজকে পশ্চিম দিকে উঠল? কী জাদু করলি রে শুভ?’

রুভা বলল, ‘তুমি বুঝবে না মা। টাইম মেশিনে তো কখনো চড়োনি।’

‘টাইম মেশিন?’ মা অবাক হলেন।

শুভ হেসে বলল, ‘ভাচুর্য়াল রিয়েলিটির টাইম মেশিন।’

বাবা রুভাকে বললেন, ‘তোর ট্যাবে তো দেখলাম বেশি চার্জ নেই। চার্জ দিসনি কেন? কম চার্জে কিন্তু ট্যাব ধরতে দেব না। রেডিয়েশন বের হয়।’

রুভা মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, ‘ছাড়ো তোমার ট্যাব। ট্যাব কে দ্যাখে!’

মা-বাবা একসঙ্গে অবাক হয়ে গেলেন। শুভ হেসে ইলিশের লম্বা কাঁটা বাছতে বাছতে বলল, ‘কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়। শুধু শুধু চেঁচামেচি করে লাভ হয় না রে।’ ❑

শিশুসাহিত্যিক

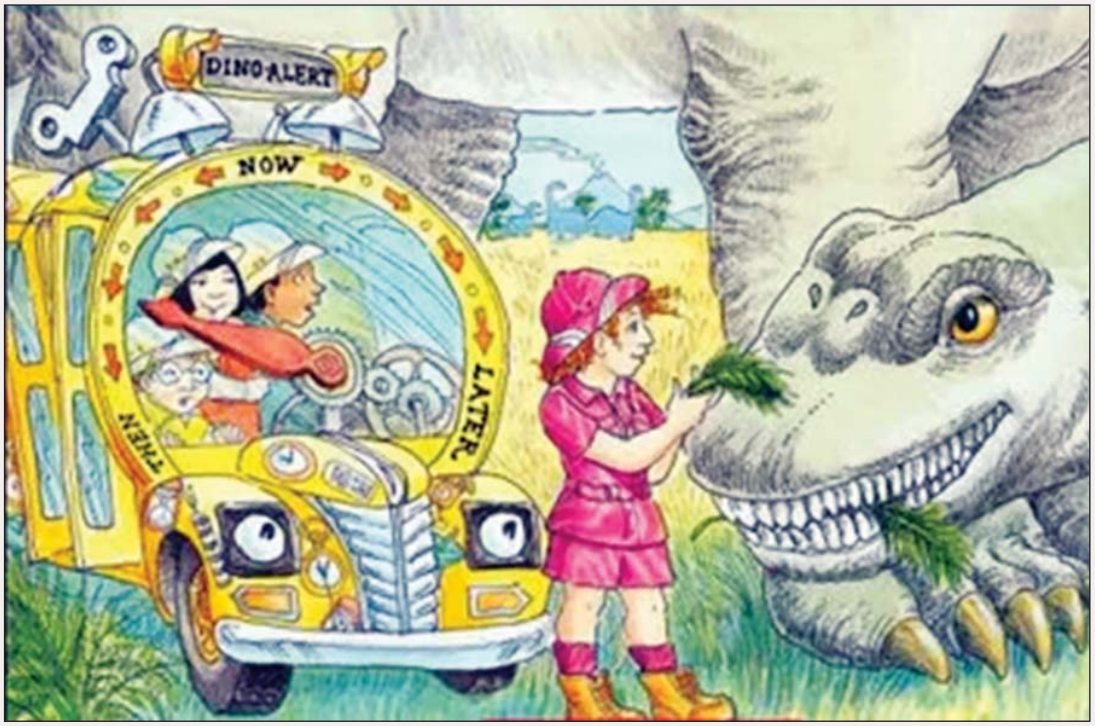

রহস্য কথা

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত

পৃথিবীর শেষ প্রান্ত কোথায়? ছেলেবেলা থেকেই আমাদের পৃথিবীর শেষ প্রান্ত কোথায় জানতে ও যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমাদের গ্রহটা যেহেতু গোলাকার তাই শেষ প্রান্ত বলে আসলে কিছু নেই। তবে ইউরোপ মহাদেশের নরওয়েতে প্রাইকেস্টোলেন নামে একটি পাহাড়চূড়া রয়েছে যাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত বলা হয়ে থাকে। প্রায় ২০০০ ফুট উঁচুতে থাকা পাহাড়চূড়াটি প্রায় ৮২ বর্গফুট প্রশস্ত। নিচে রয়েছে স্বচ্ছ পানির জলাধার। প্রাইকেস্টোলেন একটি দীর্ঘ সরু সামুদ্রিক খাঁড়ির পাশে অবস্থিত। প্রায় ১০ হাজার বছর আগে তুষার যুগের ফলে এই রকম

পাহাড়ের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অতীতে প্যাগান ধর্মের লোকেরা এখানে উপাসনা করত। ১৯০০ সালে সর্বপ্রথম এই জায়গায় পর্যটন ব্যবস্থা চালু হয়। এই স্থানে পৌঁছানোর জন্য প্রায় চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে যেতে হবে। শীতকালে বরফে ঢাকা এই জায়গাটি দেখতে অপরূপ। এই পাহাড়ের কিনারায় দাঁড়ালে মনে হবে যেন মেঘের ওপড়ে দাঁড়িয়ে আছি । এখানকার বাতাস অত্যন্ত শুদ্ধ। যে কারণে এই শুদ্ধ বাতাস বোতলজাত করে বিক্রি করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর আয়না

যদি আকাশে হাঁটা যায় তবে কেমন হয় বলো তো বন্ধুরা? কি অবাক হচ্ছো? আসল আকাশ না হলেও তোমরা হেঁটে আসতে পারো আকাশের প্রতিবিম্বের ওপর। পৃথিবীতে এমন এক জায়গা আছে যেখানে প্রকৃতি নিজেই আয়নার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

অবাক করা এমন স্থানটি বলিভিয়ায় অবস্থিত। বলিভিয়ার অন্তর্ভুক্ত আলতিপ্লানো মালভূমির এ অংশ 'সালার দা ইউনি' নামে পরিচিত। যার অর্থ লবণের সমাহার। এখানে আকাশ ও পৃথিবী যেন একসাথে মিশে গেছে হাতে হাত ধরে। যেন এক উলটানো আকাশ। অতীতে এই অঞ্চলটি সমুদ্রের নিচে ছিল। 'সালার দা ইউনি' অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। ৪,০৮৬ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এ মালভূমি অঞ্চল। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বর্ষাকালীন বৃষ্টি ও আশপাশের হ্রদগুলোর প্রবাহিত হওয়া জল 'সালার দা ইউনি'কে এক জলাশয়ে পরিণত করে। আর তখনই মাইলের পর মাইল সৃষ্টি হয় এ বিশাল প্রাকৃতিক আয়না। শুকনো মৌসুমে সালার পরিণত হয় বিশাল লবণের মরুভূমিতে। এখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠীরা লবণ সংগ্রহ ও বিক্রি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তৈরি হওয়া এই আয়নায় আকাশের চমৎকার প্রতিবিম্ব দেখা যায়। 'সালার দ্যা ইউনি'র অপার্থিব সৌন্দর্যের কারণে জায়গাটি বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। 'সালার দ্যা ইউনি'র সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অপার সৌন্দর্যের মধ্যে অন্যতম।

নরকের দরজা

নরক শব্দটি শুনলেই প্রথমে যে কথাটি মাথায় আসে সেটি হলো এমন একটি স্থান যেখানে শুধু পাপীদের অবস্থান হবে। যেখানে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে থাকবে অনবরত। নরক যন্ত্রণা সম্পর্কে কমবেশি আমরা সবাই জানি। কিন্তু যদি বলা হয় পৃথিবীর বুকে আছে এমনই এক জ্বলন্ত নরক তাহলে সেটি কি বিশ্বাসযোগ্য? অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি। মধ্য এশিয়ার দেশ তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী আশগাবাত থেকে ২৬০ কিলোমিটার দূরে নরকের দরজা। তুর্কমেনিস্তান শহরের একটি মরুভূমির নাম কারাকুম। এই কারাকুম মরুভূমিতে আছে একটি জ্বলন্ত গর্ত। যেখানে গত ৫০ বছর ধরে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা আগুন জ্বলছে। আর এই জ্বলন্ত গর্তের নামই হলো 'নরকের দরজা' বা 'ডোর টু হেল'। বিশ্বের ভয়ংকর স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো এই নরকের দরজা। মূলত অতিমাত্রায় মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির কারণেই সৃষ্টি হয়েছিল এই নরকের দরজা। স্থানটিতে এতই উত্তাপ যে কয়েক মিনিটের বেশি থাকা সম্ভব হয় না। গর্তের ব্যাসার্ধ ৬৯ মিটার এবং গভীরতা ৩০ মিটার। স্থানীয়দের বিশ্বাস এই দরজা দিয়েই যেতে হবে নরকে। নরকের দরজার প্রকৃত রূপ দেখা যায় রাতের অন্ধকারে।

পার্কে স্কুবা ডাইভিং

স্কুবা ডাইভিং কথাটি শুনলে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে সাগরের তলদেশে জগৎ দেখার জন্য স্কুবা ডাইভিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। অস্ট্রিয়ার উত্তর-পূর্বে স্টাইরিয়া এলাকার হস্কোপ পর্বতমালার নিচে সবুজ পানির চমৎকার একটি লেক ও পার্ক রয়েছে। অস্ট্রিয়ান ভাষায় একে বলে 'গ্রিন সি' বা সবুজ লেক। যেখানে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্কুবা ডাইভিংয়ের মাধ্যমে পার্কে ঘুরে আসা যায়।

তুষারে আবৃত পর্বত দিয়ে ঘেরা চমৎকার এই পার্ক ট্র্যাকিং ও অ্যাডভেঞ্চারের জন্য বেশ জনপ্রিয়। গ্রীষ্মের সময় পর্বতের তুষার গলা পানিতে তলিয়ে যায় এই পার্ক। পার্ক তখন পরিণত হয় নয়নাভিরাম সৌন্দর্যে। স্বচ্ছ পানির নিচে পার্কের বেঞ্চ, ছোটো ব্রিজ, ট্রেইল, বড়ো বড়ো গাছগুলো পানিতে তলিয়ে যায়। সৃষ্টি হয় পানির নিচে অবিশ্বাস্য এক অতিপ্রাকৃত পার্ক। একবার পানিতে নামলেই এই অনন্য অসাধারণ পৃথিবীটা দেখতে পারবে। মনে হবে পুরো পৃথিবীটাই পানির নিচে তলিয়ে আছে। বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সাথেও দেখা মিলবে।

টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ

বিশ্বের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাহাজ দূর্ঘটনার মধ্যে টাইটানিক জাহাজ অন্যতম। ১৯১২ সালে টাইটানিক জাহাজ ডুবে যাওয়ার ঘটনাটি আমরা সবাই জানি। টাইটানিক ডুবে যাওয়ার পর

কেটে গেছে ১১১বছর! এবার প্রথমবারের মতো টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের একটি নতুন ভিডিও ও ছবি প্রকাশিত হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, সমুদ্রের তলায় জাহাজটি দুটো অংশে ভাগ হয়ে পড়ে আছে। ১৯১২ সালের ১০ই এপ্রিল ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন থেকে নিউইয়র্ক সিটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ১৪ই এপ্রিল রাতে বরফের সাথে ধাক্কা লাগলে জাহাজটি ধীরে ধীরে তলিয়ে যায়। জাহাজটি আটলান্টিক মহাসাগরে ৩৮০০ মিটার গভীরে তলিয়ে যায়। এবারের অনুসন্ধানে গভীর সমুদ্রের ম্যাপিং ব্যবহার করে টাইটানিকের প্রথম পূর্ণ আকারে ডিজিটাল স্ক্যান তৈরি করা হয়েছে। যাতে পুরো জাহাজের স্পষ্ট থ্রিডি দৃশ্য উঠে এসেছে। দেখে মনে হবে সমুদ্রের পানি সরিয়ে ছবি তোলা হয়েছে। নিমজ্জনযোগ্য একটি বিশেষ জাহাজে করে একদল কর্মী এই জরিপ পরিচালনা করেছে। টাইটানিকের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ জরিপ করতে তারা পানির নিচে ২০০ ঘণ্টা অতিবাহিত করে। প্রতিটি কোণ থেকে জাহাজটির ৭ লক্ষাধিক ছবি তোলে। ছবি তোলার সময় জাহাজের কোনো কিছু স্পর্শ করেনি। গবেষকগণ বলেন, ১০০ বছর পরেও জাহাজটির বডি এখনো ভালো আছে।

কোকাকোলা রেসিপি ভল্ট

কোকাকোলা ইংরেজিতে Coca-cola যা বর্তমানে সংক্ষেপে কোক নামেই পরিচিত। এটি এক প্রকার কার্বোনেটেড কোমল পানীয়। পৃথিবীতে যত গোপন বিষয় আছে তার মধ্যে অন্যতম হলো কোকাকোলার রেসিপি। কোকাকোলার রেসিপি আবিষ্কারক হলেন আটলান্টার ফার্মাসিস্ট জন এজ পেমবার্টন। এই ভদ্রলোক আমাদের ভাষায় হাতুড়ে ডাক্তার ছিলেন। তবে এই আবিষ্কারক কোকাকোলার রেসিপি বিক্রি করে দেন আরেকজন আটলান্টা ফার্মাসিস্ট ও ব্যবসায়ী কান্ডেলারের কাছে। এই কান্ডেলার কোকাকোলাকে পৃথিবীব্যাপী জনপ্রিয় করে তোলেন। যুগ যুগ ধরে গবেষকরা চেষ্টা করছেন এর রেসিপি নিয়ে। বিশ্বের ২০০টিরও বেশি দেশে কোকাকোলা বিক্রি হয়।

কোকাকোলার উপাদানের বিখ্যাত গোপন সূত্রটি একটি ভল্টে সুরক্ষিত আছে। কান্ডেলার ফরমুলাটি নিরাপদ রাখার জন্য তৎকালীন জর্জিয়া ট্রাস্ট ব্যাংক-এ রাখেন। কর্মীরা কোকাকোলার উপাদানের পাত্র থেকে সমস্ত লেভেল (উপাদানের নাম) মুছে ফেলেন এবং শুধুমাত্র রং ও গন্ধ দ্বারা শনাক্ত করেন। ১৯২৫ সালে কোকাকোলার সূত্রের একমাত্র লিখিত অনুলিপি নিউইয়র্কের একটি ব্যাংক থেকে উদ্ধার করে তা আটলান্টা ব্যাংকের নিরাপদ ভল্টে রাখা হয়েছে। ২০১১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ফরমুলাটি ব্যাংকের ভল্ট থেকে নিজস্ব ভল্টে রাখা হয়। এটি এখন ডাউনটাউন আটলান্টায় কোম্পানির আকর্ষণ কেন্দ্র কোকাকোলা ওয়ার্ল্ডে একটি ২০ ফুট লম্বা ভল্টের ভিতর রয়েছে। চিরস্থায়ীভাবে সেখানেই থাকবে। সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারে না সেখানে।

টাইটান সাবমেরিনের পরিণতি

আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে একই পরিণতি হলো টাইটান সাবমেরিনের পর্যটকদের। টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষের পাশে পাওয়া গেল টাইটান সাবমেরিনের ধ্বংসস্তূপ। সমুদ্র পর্যটনে এই সাবমেরিন পাঠিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ওশানগেট। ১৮ই জুন টাইটান সাবমেরিনে চড়ে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হন পাঁচ পর্যটক। চারদিন মহাসাগরের তলদেশে ব্যাপক

তল্লাশির পর ২২শে জুন উদ্ধারকারীরা সাবমেরিনটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়। সেই সাথে পর্যটকদের মৃত্যু সম্পর্কেও নিশ্চিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড সংবাদ সম্মেলন করে জানান, টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষের আশপাশে আরও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সেগুলোর মধ্যে টাইটান সাবমেরিনের বড়ো পাঁচটি টুকরার সন্ধান পাওয়া গেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, কোনো একটি ছোটো ছিদ্রের জন্য টাইটানের এমন অবস্থা হতে পারে অথবা আটলান্টিক মহাসাগরের প্রবল পানির চাপে এই বিস্ফোরণটি হতে পারে। প্রসঙ্গত, ডুবোযানটি ৩৫০০ মিটার নিচে থাকা অবস্থায় সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাবমেরিনের ভেতরে ছিলেন পাঁচজন আরোহী– ব্রিটিশ ধনকুবের হামিশ হার্ডিং (৫৮), পাকিস্তানি ধনকুবের শাহজাদা দাউদ (৪৮) এবং তাঁর ছেলে সুলেমান দাউদ (১৯), ফ্রান্সের নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য পল অঁরি নাজোলে এবং ওশান গেটের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্টকটন রাশ। ❑

খোকার প্রশ্ন

অজিত রায় ভজন

খোকা যখন তাকায় আকাশপানে
হাজার প্রশ্ন তোলে মায়ের কানে।
কেমন করে উড়োজাহাজ ওড়ে,
তার ডানা তো একটুও না নড়ে।

মেঘের ভেলা কেমন করে ভাসে
বৃষ্টি হয়ে আবার পড়ে ঘাসে,
আবার দেখি আকাশে দেয় পাড়ি,
শূন্য মাঝে কেন মেঘের বাড়ি?

ঝিকমিকিয়ে তারা হাসে রাতে,
মিটমিটিয়ে আলোও দেয় সাথে।
কেমন করে ঝুলে ওরা থাকে,
কেমন করে আলপনাটা আঁকে?

রাত্রিবেলা ঠিক ঘুমানোর আগে
আরও কত প্রশ্ন খোকার জাগে।
নানান কথার জবাব দিয়ে মায়ে,
দেন উঠিয়ে ঘুমের গহীন নায়ে।

ক বি তা গু চ্ছ

রহস্য

সালাম ফারুক

প্রশান্তর ওই জাপানকূলে কারণ ছাড়া রাস্তা ভুলে
নয়টি জাহাজ হারায়,
শান্ত-নিখুঁত আবহাওয়াতে চিহ্নসহ নাই হওয়াতে
প্রশ্ন অনেক দাঁড়ায়।

রহস্যটা খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা খেই হারিয়ে
আজও মাথা নাড়ায়,
তাই তো সবাই বলে থাকে 'শয়তানেরও সাগর' তাকে
শুনেই পশম দাঁড়ায়।

সার্বিয়ার এক জায়গা আছে পরিচয়টা সবার কাছে
শয়তানেরই নগর,
কীভাবে তা উঠল গড়ে ভূতুরে সেই গল্প পড়ে
শিউরে ওঠে গতর।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েমিংয়েতে বসে আছে আসন পেতে
শয়তানেরই টাওয়ার,
পর্যটকের ভিড় পড়ে যায় দুঃসাহসী ওঠে চূড়ায়;
জাগছে কি সাধ যাওয়ার?

লাল ঝরনা

রানা কুমার সিংহ

একদিন সক্কাল, এসে বলে বর্ণা
অ্যান্টার্কটিকাতে আছে এক ঝরনা
ঝরনার পানি লাল
বয়ে চলে বহুকাল
সেই কথা জেনে নিতে গুগলেই ধর্না!

গুগলের তথ্যে হইনি কো ফেইল'র
উনিশ'শ এগারোয় গ্রিফিথ টেইলর
গ্লোসিয়ারে অভিযান
করে এর খোঁজ পান
বিজ্ঞান জেনে নেয় রহস্য-উত্তর।

বরফের নিচে তেরোশত ফুট গভীরে
জলাশয় আছে এক বলে যাই কবিরে
লোহা আর সালফার
জলাশয়ে একাকার
সেই থেকে রক্তের রঙে জল-ছবিরে!

গ্রিফিথের বাড়ি কই– জেনে নাও অদ্য
অস্ট্রেলিয়ার তিনি আহা অনবদ্য।

অমীমাংসিত রহস্য

শাহানা আফরোজ

ডেভিলস সী

দূর সমুদ্রের বুকে পাড়ি দেয়ার কিছুদিন পরেই একটি জাহাজ হঠাৎ করে উধাও হয়ে যায়, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো হদিস মেলে না। কোথায় হারিয়ে গেল জাহাজটি? কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল নাকি লুকিয়ে থাকা কোনো গোপন শক্তির কবলে পড়েছিল? এমনই এক রহস্য ঘেরা জায়গার নাম ডেভিলস সি বা শয়তানের সাগর। দশকের পর দশক জুড়ে এই রহস্যময়তার কারণে জায়গাটি সাগরের বুকে একটি অশুভ স্থান হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত। জাপান এবং বোনিন দ্বীপের মধ্যবর্তী একটি জায়গা 'ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল' হিসেবে পরিচিত। আর এর আশপাশের এলাকাটিকেই বলা হয়ে থাকে ডেভিলস সি বা শয়তানের সাগর। এটি জাপান, তাইওয়ান এবং ইয়াপ দ্বীপপুঞ্জকে সংযুক্ত করেছে। ছোটো ছোটো নৌকা থেকে শুরু করে বিশাল জাহাজ এমনকি এ জায়গার ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বিমানগুলোও মুহূর্তেই উধাও হয়ে যায়। চীনে প্রায় ১০০০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে একটি পৌরাণিক মতবাদ অনুযায়ী, এই সাগরের পানির অতল গহীনে লুকিয়ে রয়েছে এক বিশাল ড্রাগন।

সে যখন পানির নিচে চলাফেরা করে তখন সাগরের বুকে বড়ো বড়ো ঢেউ, ঘূর্ণিপাক, সামুদ্রিক ঝড়সহ চারদিকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায়। ড্রাগন তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠে চলাচলরত বিভিন্ন জাহাজ বা আকাশপথে চলমান কোনো বিমানকে টেনে পানির নিচে নিয়ে যায় এবং তাতে থাকা মানুষ খেয়ে ফেলে। এ কারণেই জায়গাটি 'ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল' নামে পরিচিত হয়ে আসছে। চেঙ্গিস খানের নাতি কুবলাই খান ১২৭৪ সালে এবং ১২৮১ সালে জাপান আক্রমণ করেন। কিন্তু দুবারই তিনি ব্যর্থ হন। কারণ শয়তানের সাগর এলাকায় মারাত্মক টাইফুনের কবলে পড়ে তার বাহিনী। কুবলাই খানের বেশ কয়েকটি জাহাজ এবং প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য এই সাগরে হারিয়ে যায়।

১৮০০ শতকের দিকে লোকমুখে প্রায়ই শোনা যেত, অনেকেই ওই এলাকায় জাহাজে করে এক রহস্যময় নারীকে প্রদক্ষিণ করতে দেখেছে। কিছু অদ্ভুত ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ১৯৫০ সালে জাপান সরকার রহস্যের কারণ উদঘাটনের উদ্দেশ্যে ৩১ জন ক্রু-বিশিষ্ট কাইও মারু নং ৫ নামক একটি বিশেষ জাহাজ পাঠান। দুর্ভাগ্যবশত এই অনুসন্ধানকারী জাহাজটিও নিখোঁজ হয়ে যায়। এর ঠিক দু'বছর পর ৬০ টন ওজনবিশিষ্ট তোশি মারু নামক আরেকটি জাপানি জাহাজ একইভাবে গায়েব হয়ে যায়। দুর্ঘটনার সময়গুলোতে আবহাওয়া একদম শান্ত ছিল এবং জাহাজগুলো থেকে কোনো ধরনের সাহায্যের আবেদনও করা হয়নি।

বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত পৃথিবীতে সর্বমোট ১২টি স্থান রয়েছে যেখানে তীব্র চৌম্বকীয় আকর্ষণ অনুভূত হয়। আর ডেভিলস সী বা শয়তানের সাগরে অবস্থিত 'ড্রাগন ট্রায়াঙ্গল' এমনই এক জায়গা। অনেক সম্ভাব্য কারণের মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে মুখ্য কারণ বলে ধরে নেয়া হয়। একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বলা হয় আলোচিত অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ মিথেন হাইড্রেট মজুদ রয়েছে। এসব গ্যাস যখন বিস্ফোরিত হয় সেই বিস্ফোরণের ফলেও জাহাজ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। অনেকে মনে করেন অঞ্চলটি ভাইস ভার্টিসেসের অন্তর্গত, একইসঙ্গে উষ্ণ এবং শীতল সামুদ্রিক জলের প্রবাহের কারণে এখানে সমস্যা দেখা দেয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা এখানে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ডিস্টারবেন্সের কারণে জাহাজগুলো অদৃশ্য ফাঁদে আটকে যায়। তবে কোনোটিই এই স্থানের রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ অনেকটা এগিয়ে গেলেও প্রকৃতির কিছু রহস্যের কাছে আজও হার মেনে নিতে হয়।

ডেভিলস ক্যাটেল

যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিয়ার লেকের উত্তর দিকে একটি রহস্যময় ঝর্ণা অবস্থিত। ঝর্ণাটি মিনেসোটা স্টেটের জাজ ম্যাগনি স্টেট পার্কের অংশ। এই ঝর্ণা দুই ভাগে বিভক্ত। এর পূর্ব দিকের অংশ একেবারেই সাধারণ ঝর্ণার মতো। ঝর্ণার পানি নিচে পড়ে ব্রুল নামক নদীতে গিয়ে মিশে। কিন্তু ঝর্ণার পশ্চিম দিকের অংশ একেবারেই অস্বাভাবিক। এই ঝর্ণার ঠিক নিচে একটি গর্ত রয়েছে। ঝর্ণার এই অংশের পানি এই গর্তেই পড়ে। স্বাভাবিকভাবে পানি সামনের দিকে প্রবাহিত হয়। বিস্ময়কর বিষয় হলো, এই গর্তে ঝর্ণার পানি কোন দিকে প্রবাহিত হয় তা বুঝা যায় না! ঝর্ণার পানি নির্দিষ্ট ওই গর্তেই মিলিয়ে যায়। তবুও গর্ত কখনো ভরে না। তাহলে এই গর্তে প্রত্যেক মিনিটে পড়া লাখ লাখ লিটার পানি কোথায় যায় ? এ প্রশ্নের উত্তর এখনো জানা যায়নি। কয়েক দশক আগেও অনেকের

ধারণা ছিল এই গর্তের অনেক গভীরে ছোটো ছোটো ছিদ্র বা ফাটল আছে। ঐ ফাটল দিয়ে পানি পাশের ঝর্ণার পানির সঙ্গে মিশে যায়। এই তথ্যকে প্রমাণ করতে ঝর্ণার পানির সাথে রং মেশানো হয়। কিন্তু অবাক করার বিষয় হলো রঙিন পানি ঐ গর্তেই বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে, পাশের ঝর্ণার পানি রঙিন হয়নি। আরো অনেক পদ্ধতিতে এই ঝর্ণার পানির গন্তব্যস্থল জানার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এর রহস্য আজও ভেদ হয়নি।

শয়তানের শহর

দুটি উপত্যকা। উচ্চতা প্রায় ২০ মিটার। প্রতিটি উপত্যকায় মাটির টুপি পরানো। টুপিগুলো উপত্যকা চেয়েও বড়ো। অনেকে একে 'ড্রাগনের ঘর' বা 'ড্রাগনের মাথা' বলে। স্থানীয়দের মতে উপত্যকা দুটির একটি 'শয়তানের উপত্যকা' এবং অন্যটি 'অভিশপ্ত উপত্যকা' হিসেবে পরিচিত। দুটি উপত্যকাকে একসঙ্গে 'শয়তানের শহর' বলা হয়।

ডিজেভোলজা ভারুস (শয়তানের শহর) রদন পর্বতের দক্ষিণ দিকে কুরসুমলিজা থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে জেবাইচ এবং ডেক গ্রামে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৬৬০-৭০০ মিটার। ডিজেভোলজা ভারুসের গঠন প্রক্রিয়া পুরোপুরিভাবে এখনো জানা যায়নি। প্রতিদিন পাথরের স্তম্ভগুলো ভেঙে পড়ে। দেখলে মনে হবে কোনো এক অদ্ভুত রহস্যময় কিছু এখানে কাজ করছে। স্থানীয়দের কাছে পৌরাণিক কাহিনি প্রচলিত আছে যে, স্বয়ং শয়তান নাকি এই কাজগুলো করে।

সেখানে দুটি বিরল ধরনের ঝর্ণা দেখা যায়। প্রথমটা ডিজেভোলজা উপত্যকা থেকে প্রবাহিত হয়। এই প্রবাহিত পানি 'শয়তানের পানি' নামে পরিচিত। এখানকার পানিতে অতিরিক্ত পরিমাণে এসিড রয়েছে। অন্য ঝর্ণা থেকে প্রবাহমান পানি স্বাভাবিক। এই পানির ধারা বসন্তকালে এলাকার চারদিকে দেখা যায়। ডিজেভোলজা ভারুসে ২টি রহস্যময় খনিজ পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল যা পুরাতন গির্জার ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করা হয়।

এই স্থানটি নিয়ে অনেক শিউরে ওঠার মতো ভূতুড়ে গল্প প্রচলিত আছে। অনেক দিন আগে দুটি ভিন্ন গ্রামের দুটি ছেলে বিয়ে করতে যাচ্ছিল অন্য এক গ্রামে। আশ্চর্যজনকভাবে তাদের দু'পক্ষের বিয়ের পাত্রী ছিল একই মেয়ে। কিন্তু উভয়পক্ষ যখন বুঝতে পারল যে তাদের হবু বধূ একই, তখন পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে গড়াতে যাচ্ছিল। উভয় বরযাত্রীরা একটি সবুজ উঁচু ঢিবিতে একে অন্যের দিকে এগিয়ে এসে কটমট দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। তখন ঈশ্বর চাচ্ছিলেন না যে সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটুক। আর এ জন্য তিনি ঐ দু'দলকে উপত্যকায় রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন যতক্ষণ না কোনো সমাধান বের হয়। ফলে তারা উপত্যকা হিসেবে রয়ে গেল বছরের পর বছর। এটিই হলো এলাকাটি নিয়ে প্রচলিত মিথ। এলাকাটি সত্যিই অদ্ভুত! সেখানে অদ্ভুত সব তড়িৎচুম্বকীয় ঘটনা ঘটে। ১৯৫০ সালে এই জায়গায় একটা বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এর কারণ এখনো কেউ বের করতে পারেনি।

ডেভিলস ট্রি বা টাওয়ার

পশ্চিম আমেরিকার ওয়াইওমিং রাজ্যের ব্ল্যাক হিল অঞ্চল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যখন দর্শনার্থীরা বেল ফশ নদীর তীরে পৌঁছায়, তখন সবারই চোখ আটকে যায় একটি টাওয়ার সদৃশ বস্তুর উপর। বিশ্বের সবচেয়ে অসাধারণ চূড়াগুলোর একটি এই টাওয়ার। যা ডেভিলস ট্রি বা টাওয়ার নামে পরিচিত।

১৮৭৫ সালে স্বর্ণের মজুদ অনুসন্ধানে আমেরিকান কর্নেল রিচার্ড আরভিং ডজের ব্ল্যাক হিল অঞ্চলে একটি ভূতাত্ত্বিক গবেষণা চালান। তারা সেখানে কোনো সোনা খুঁজে পেলেন না ঠিকই, তবে এই টাওয়ারের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। টাওয়ারটি প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি। দেখতে অনেকটা খাঁজকাটা চূড়ার মতো। উচ্চতা ২৬৫ মিটার বা ৭৬৮ ফুট। এটির চূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫,১১২ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত।

ডেভিলস টাওয়ার আমেরিকার সর্বপ্রথম স্বীকৃত জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ। ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট একে জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করেন। এই টাওয়ারটি আগ্নেয়গিরি পাথর দ্বারা তৈরি হলেও এটি আসলে আগ্নেয়গিরি না। এমনকি আশপাশেও কোনো আগ্নেয়গিরি নেই। অনেকে মনে করত, এটি আসলে ভেতর দিকে ফাঁপা। তবে ভূতাত্ত্বিকরা মনে করেন এটি ফাঁপা নয়। এর চূড়ার উপরের অংশ প্রায় একটা ফুটবল মাঠের সমান উঁচু। জুন মাসে এর চূড়ায় ওঠার অনুমতি নেই, কারণ সে সময় এখানে অনেক নেটিভ আমেরিকান ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে। এছাড়া কিছু রাস্তা শীতের সময় পাখিদের বাসা বোনার জন্য বন্ধ করে রাখা হয়।

এই টাওয়ারকে ডজ নেটিভ আমেরিকানরা ডাকত হোম অভ বিয়ার বা ভাল্লুকের বাসস্থান। তবে যে ব্যক্তি নেটিভ আমেরিকার মানুষদের দেওয়া নামের অনুবাদ করেন, তিনি ভুলবশত Bad Gods Tower বা শয়তানদের পাহাড় বা শয়তানের টাওয়ার/ ডেভিলস টাওয়ার (Devils Tower) বা খারাপ দেবতার টাওয়ার অনুবাদ করেন। কর্নেল ডজ তাই এর নাম দেন- শয়তানদের পাহাড় বা ডেভিলস টাওয়ার (Devils Tower)। এই ভুল নামটিই একসময় বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

উপকথায় কথিত আছে যে, ভাল্লুকের হাত থেকে বাঁচার জন্য স্থানীয়রা একটা পাথরের উপর উঠে হাঁটু গেড়ে বসে তাদের মহৎ স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করে। মহৎ স্রষ্টা তাদের প্রার্থনা শুনতে পায় এবং তাদের বাঁচাতে পাথরটিকে স্বর্গের দিকে প্রসারিত করে দেয়। তা-ও ভাল্লুকেরা চূড়ায় ওঠার চেষ্টা করতে থাকে। আর ভাল্লুকের নখের আঁচড়ে টাওয়ারের গায়ে খাঁজকাটা আকৃতি দেখা দেয়।

ডেথ অব ভ্যালি, রাশিয়া

বরফে মোড়া হিমশীতল আগ্নেয়গিরির প্রান্তের একটি ছোট উপত্যকায় রহস্য ছড়িয়ে আছে পরতে পরতে। উপত্যকার এই অংশে পা রাখলেই নাকি মাথা ঝিমঝিম করে। ঘুম পায়। এমনকি মাথাব্যথাও করে। উপত্যকায় জীবজন্তু প্রবেশ করে কিন্তু আর বাইরে বের হতে পারে না। বেশিরভাগ প্রাণীই তৎক্ষণাৎ সেখানে মারা যায়। তীব্র ঠান্ডায় তাদের নিথর দেহগুলো অবিকৃত থাকে। বাইরে থেকে কোনো অসুখ এবং আঘাতের চিহ্নও দেখা যায় না। রাশিয়ার ডেথ অব ভ্যালি কামচাটকা উপদ্বীপের রহস্য এবং জীববৈচিত্র্য যেন একে অপরকে পাল্লা দেয়।

এর কারণ জানাতে গিয়ে রাশিয়ার ইনস্টিটিউট অব ভলক্যানোলজি অ্যান্ড সিসমোলজি-র আগ্নেয়গিরি বিশেষজ্ঞ ভ্লাদিমির লিয়োনোভের ধারণা, প্রাণীগুলোর মৃত্যুরহস্যের কারণ হলো আগ্নেয়গিরি। ১৯৭৫ সালে তিনিই এই উপত্যকার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এখানে বেশিরভাগ আগ্নেয়গিরিই অতি সক্রিয়। বরফে ঢাকা আগ্নেয়গিরির এই উপত্যকাকে ইউনেস্কো 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' এর তকমা দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই উপদ্বীপে সালফারডাই- অক্সাইড, হাইড্রোজেন পার অক্সাইডের মতো গ্যাসের উপস্থিতি এতটাই বেশি যে, জীবজন্তুরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে নিজেদের অজান্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ফলে তাদের দেহে কোনো আঘাতের চিহ্নই থাকে না।

কামচাটকা উপদ্বীপের জনসংখ্যা সাড়ে ৩ লাখেরও কম। অনুমতি সাপেক্ষে এর বহু অংশেই যাওয়া যায়। উৎসাহী, গবেষক এবং পর্যটকরাও যান এই উপদ্বীপে। তবে উপত্যকার 'ভ্যালি অব ডেথ' অংশে সাধারণের প্রবেশ কার্যত নিষিদ্ধ।

রাজস্থানের ভানগড় দুর্গ

রাজস্থানের আলবর জেলায় অবস্থিত ভানগড় দুর্গ এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে ভীতিকর স্থানগুলোর একটি। বিশ্বের সেরা দশটি হন্টেড স্থানের একটি হিসেবে ধরা হয় ভানগড় দুর্গকে। সন্ধ্যা ৬টার পর কেল্লার ভেতরে কাউকে অবস্থান করতে দেওয়া হয় না- এটা রীতিমতো সরকারি আদেশ। তাই বিকাল সাড়ে ৫টা থেকেই দুর্গের ভেতর থেকে পর্যটকদের বের করে দেওয়া শুরু করে নিরাপত্তাকর্মীরা- যাতে ভুলেও কেউ নির্দিষ্ট সময়ের পর সেখানে রয়ে না যায়। ভানগড়ের সীমানায় একটি বোর্ডও রয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে যে সূর্যোদয়ের আগে এবং সূর্যাস্তের পরে ভানগড়ে থাকা কঠোরভাবে বারণ। কিন্তু এই নিষিদ্ধতার কারণ কি?

ভারতের স্থাপত্যের এই নিদর্শনটি তৈরি করেছিল ভগবন্ত দাসের ছোটো ছেলে মাধো সিং। সপ্তদশ দশকে এই দুর্গ তৈরি হয়েছিল। দুর্গের প্রতিটি ইটে রয়েছে মোগল সাম্রাজ্যের আভিজাত্যের চিহ্ন। যদিও

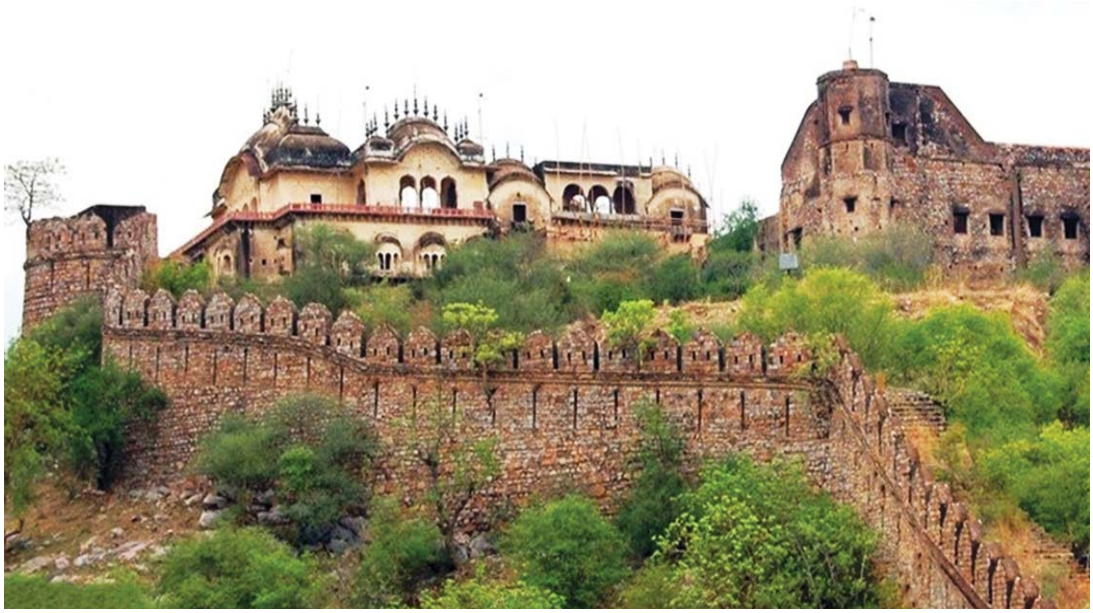

এই কেল্লার চারপাশে নেই কোনো জনবসতি। বিশ্বের সেরা দশটি ভূতুড়ে স্থানের একটি হিসেবে ধরা হয় ভানগড় কেল্লাকে। এই কেল্লাকে কেন ভূতুড়ে হিসেবে ধরা হয় তার নির্দিষ্ট কিছু ইতিহাসও রয়েছে। যেমন কথিত আছে এক সাধুর অভিশাপে ভস্ম হয়েছিল এই দুর্গ। সেই শাপ আজও গ্রাস করে রয়েছে ভানগড় দুর্গকে। এই দুর্গের আরেকটি গল্প ঘিরে রয়েছে এক সুন্দরী রাজকুমারীর কাহিনি। সেই রাজকুমারীকে পছন্দ হয়েছিল এক তান্ত্রিক।

জাদু ছড়িয়ে বশ করার চেষ্টা করেছিলেন ওই সম্রাজ্ঞীকে। যদিও রাজকুমারী তা বুঝে ফেলে মেরে ফেলেছিলেন তান্ত্রিককে। মৃত্যুকালে যে শাপ দিয়ে গিয়েছিলেন ওই তান্ত্রিক, সেই অভিশাপ আজও ভৌতিক নগরীর তকমা দিয়েছে ভানগড়কে। স্থানীয় এলাকাবাসী থেকে পর্যটকদের অনেকেই এক ছমছমে অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেছেন। দুর্গের মধ্যে কেউ পিছু পিছু হাঁটে, কেউ পেয়েছেন নিশ্বাসের তাপ। তবে এই দুর্গে পরবর্তীতে বেশ কিছু মৃত্যুও ঘটেছে। সাহসের বশে যাওয়া কয়েকজন যুবকের একজনের প্রাণহানি হয়েছে এই দুর্গে। সে দেহ পাওয়া যায়নি পরেও। রাতের নিশুতি আধারে নূপুরের শব্দ শুনেছে একাধিকজন। যদিও আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রাতের ভানগড় দুর্গকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। তবু সাহস করে সে এলাকায় ভূতের দেখা পেতে ওৎ পাতে অনেকে। বিদেশিরাও আসেন সেই গা ছমছমে মুহূর্ত উপভোগ করতে। ❑

পার্থিব স্মারক কয়েন

সৌর শাইন

কয়েনটা দখলের জন্য আমরা অভিযান চালিয়েছি। কিন্তু... মহামান্য। এতটুকু বলে থমকে গেল।

কিন্তু আবার কী? কিষণ গ্রহের মহাপ্রশাসক সিপর মেগের প্রশ্ন। যে-কোনো মূল্যে কয়েনটা আমাদের দখলে আনতে হবে। বুঝলে তো?

যথা আজ্ঞা মহামান্য। যদিও ত্রিচক্র ব্লক নজরদারি বাড়িয়ে দিয়েছে। তবু গোয়েন্দা বিভাগ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া আমাদের 'আলোক শক্তি' অধিদপ্তরও এ ব্যাপারে সজাগ আছে।

শুভ সংবাদ, তবে যে-কোনো প্রয়োজনে আক্রমণের আগাম অনুমতি দেওয়া হলো। মঙ্গলের সর্বশেষ মূল্যবান সম্পদটি কেবলই আমাদের অধীনে থাকবে। এতটুকু মনে রেখো।

জি মহামান্য। নিরাপত্তা প্রশাসক চলে গেল।

এদিকে সিপর মেগ ভাবতে লাগলেন কী কৌশলে কয়েনটা দখল করা যায়। এ মূল্যবান বস্তুটিকে কেন্দ্র করে হয়ত ভয়ানক যুদ্ধও সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু 'কিষণ' গ্রহ এক্ষেত্রে একচুলও পিছু হটবে না। প্রায় পঞ্চাশটি গ্রহের সুপিরিয়রগণ কয়েনটির সত্ত্বাধিকার দাবি তুলেছে।

দুই

পৃথিবী ধ্বংসের পর বহুকাল কেটেছে। মানব জাতি সৌরজগতে ও মিল্কিওয়ের বাইরে বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে আশ্রয় নিয়েছে। গড়ে তুলেছে বিচিত্র নিবাস। গত শতাব্দীতে মঙ্গলগ্রহ স্মরণ অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম ইতিহাস বিজ্ঞানী থিপিন পল একটি কয়েনের কথা প্রকাশ করেন। তিনি সেদিন বলেছিলেন, দীর্ঘদিন প্রাগৈতিহাসিক বই থেকে অনুসন্ধান চালিয়ে একটি পার্থিব স্মারক কয়েনের

তথ্য পেয়েছি। ওটা একটি মঙ্গোলীয় কয়েন। যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হলে আমাদের বর্তমান মানব ইতিহাসে হবে নতুন সাফল্য সংযোজন। থিপিন পল কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের রেফারেন্সে বলেন, পৃথিবী ধ্বংসের পর, মানুষ মঙ্গলগ্রহে নিশ্চিতভাবে বসবাস শুরু করে। তখনকার মঙ্গোলীয় সুপিরিয়র পৃথিবীর স্মৃতিতে এক ধরনের সোনালি ধাতব মুদ্রার প্রচলন চালু করেন। যেখানে একপাশে পৃথিবীর মানচিত্র, অন্যপাশে ছিল সৌর জগতের চিত্র। সময়ের গতিপথ মঙ্গলগ্রহের জন্যও প্রতিকূল হয়ে ওঠে। তাই মানবজাতিকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মহাজগতের নানা প্রান্তে ছুটে যেতে হয়েছে। সে সময় একজন ব্যক্তি কেবল মঙ্গলগ্রহ ছেড়ে যেতে রাজি হননি। তিনি ওই সময়কার বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক জুরিও যোপ। প্রিয় জন্মভূমিকে ভালোবেসে মৃত্যু অবধি একা মঙ্গলে বসবাস করেছেন। তারপর গত হলো অনেক সময়।

এদিকে মানবজাতি বহুকাল পর্যন্ত মহাশূন্যে যাযাবর জীবনযাপন করেছে। অতঃপর ত্রিচক্র ব্লকের একটি উপগ্রহে ওরা উপনিবেশ গড়ে তোলে। প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে সকল পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেয়। সেখান থেকে তারপর অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহেও বসবাস শুরু করে। অন্যদিকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মিথের মতো জুরিও যোপের নাম প্রচার হয়ে আসতে থাকে। এ নামটি এক সময় গোটা মানবজাতির মধ্যে তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি করে। কারণ তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থই ছিল যুগের পর যুগ জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

থিপিন পল এক গ্লাস পানি পান করে আবার বক্তব্য শুরু করেছিলেন। বলেছিলেন, কৌতূহল থেকেই কয়েকটি গ্রহ জোট বেঁধে মঙ্গল অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যয়বহুল হলেও মানুষজন সে অভিযানের পক্ষে সাড়া দেয়। সবাই জুরিও যোপের দেহাবশেষ সম্মানের সাথে সমাধিস্থ করার পরামর্শ দেয়। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পরপরই শুরু হয় কাঙ্খিত অভিযান। দীর্ঘযাত্রা শেষে নভোচারীরা মঙ্গলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। শক্তিশালী পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে খুব সহজেই ওরা জুরিও যোপের বসবাসস্থল চিহ্নিত করে। সে এলাকা জুড়ে শুরু হয় টি-রে রশ্মির প্রতিফলন অভিযান। টি-রে রশ্মির সাহায্যে হিমশৈলীর ভেতর একটি মৃতদেহের সন্ধান পাওয়া যায়। নভোচারীরা স্থান নির্ধারণ করে বরফ কাটতে শুরু করে। গভীর খননের পর উঠে আসে একটি মানবদেহ। যা ছিল জুরিও যোপের অক্ষত মৃতদেহ।

ত্রিচক্র ব্লকে ফিরে আসার পর জুরিও যোপকে মর্যাদার সাথে সমাধি দেওয়া হয়। এই পুরো ঘটনার মাঝে ঘটে যায় আরেকটি ঘটনা। নভোচারীদের মধ্যে একজনের নাম নেসেল জিপ। তিনি জুরিও যোপের প্রাচীন জামার পকেটে একটি কয়েন খুঁজে পান। সবার অলক্ষ্যে কয়েনটি তিনি নিজের কাছে রাখেন। নেসেল জিপ কেবল পরিবারের সদস্যদের কাছে কয়েনের কথা প্রকাশ করেছিলেন। সময় গড়িয়ে কয়েনটি কয়েক প্রজন্মের কাছে হাতবদল ঘটে। এক সময় বিষয়টি সবার কাছে প্রকাশ পায়। কিন্তু এখনো জানা যায়নি কয়েনটি কোথায় আছে? কার কাছে আছে?

ইতিহাস বিজ্ঞানী থিপিন পলের এ বক্তব্যের পর থেকে সবার কাছে কয়েন প্রশ্নটি ঘুরপাক খেতে থাকে। গত এক শতাব্দী ধরে চলতে থাকে অনুসন্ধান। জুরিও যোপ ও কয়েনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় বহু কল্পসাহিত্য, নাটক-সিনেমা প্রভৃতি। অনেক চিন্তাবিদ এটাকে মহারহস্য বলে স্বীকৃতি দেন। নিরাশ হয়ে অনেকে অভিমত দেন এ কয়েন কখনোই খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বহু পরিকল্পনা ও পরিশ্রমের পর ত্রিচক্র ব্লকেরই এক অন্ধ ভিক্ষুকের কাছ থেকে পাওয়া যায় কয়েনটি। তারপর থেকে এ ঐতিহাসিক কয়েনটির সত্ত্বাধিকার নিয়ে চলছে তুমুল স্নায়ুযুদ্ধ। বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহের প্রধান প্রশাসকগণ এর উপর দাবি তুলেছেন। কিন্তু ত্রিচক্র ব্লক কিছুতেই কয়েনটি হাতছাড়া করতে রাজি নয়। যার ফলে 'কিষণ গ্রহ' ত্রিচক্র ব্লকে প্রকাশ্যে হামলার ঘোষণা দিয়েছে।

তিন

ভয়াবহ যুদ্ধাবস্থা!

চার

অভিযোগটা 'কিষণ' গ্রহের মহাপ্রশাসক সিপর মেগের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহের

প্রতি অন্যায় আচরণ। গ্রহসংঘের সৌর বার্ষিক অধিবেশনে অভিযোগটি উত্থাপন করেছে ত্রিচক্র ব্লকের সুপিরিয়ররা। ত্রিচক্র ব্লকে তিনটি উপগ্রহ 'সুপ্তি', 'ঝঞ্ঝা' ও 'ছন্দা'। তাদের দাবি, সিপর মেগ অন্যায়ভাবে ত্রিচক্রে অদৃশ্য হামলার নির্দেশ দিয়েছে।

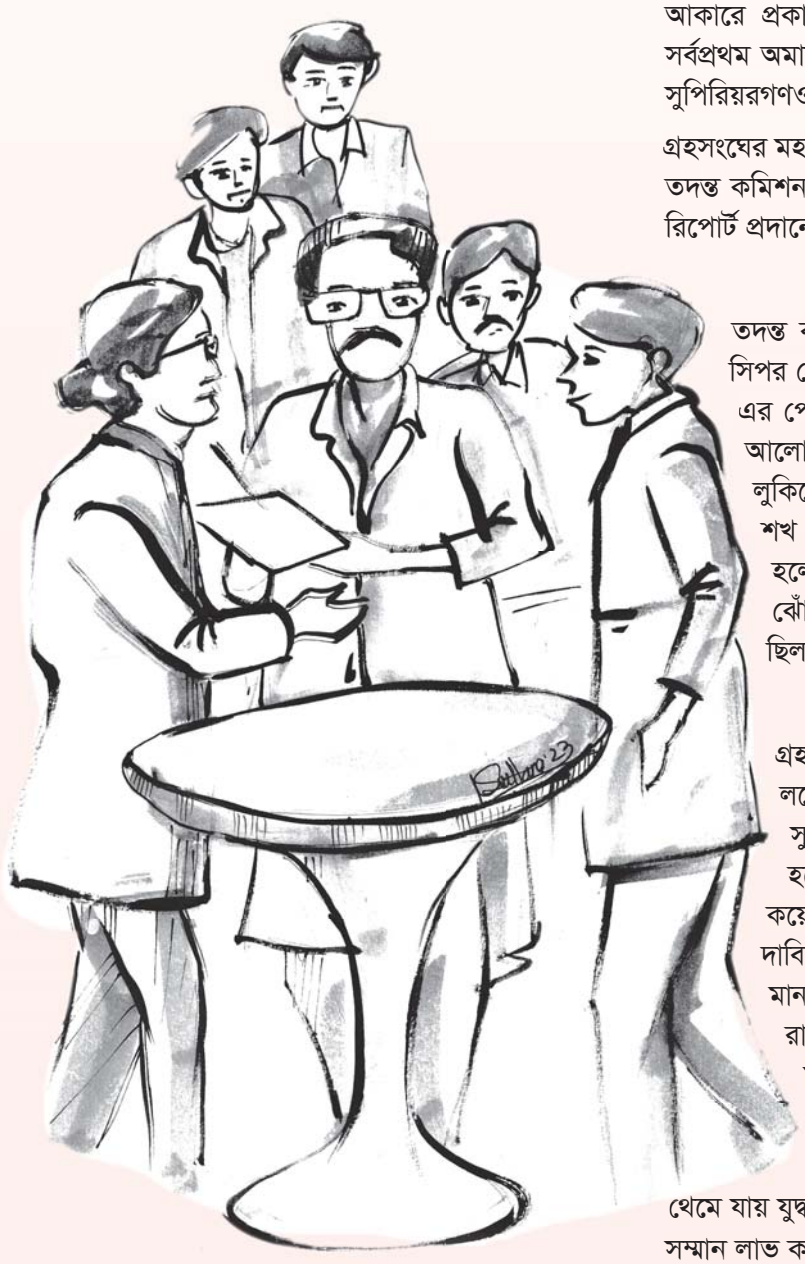

আলোক শক্তির সাহায্যে বিকল করে দিয়েছে অজস্র অবকাঠামো। এ অপরাধের ন্যায্য শাস্তির দাবি তুলে ত্রিচক্র ব্লক।

'সার্বভৌম গ্রহ-উপগ্রহে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ'। এই আইনটি গত অধিবেশনে গেজেট আকারে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'কিষণ' গ্রহ তা সর্বপ্রথম অমান্য করল। এ আচরণে অন্যান্য গ্রহের সুপিরিয়রগণও ক্ষুব্ধ!

গ্রহসংঘের মহাপরিচালক সবার মতামত নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। এবং খুব দ্রুত রিপোর্ট প্রদানের উপর জোর দেন।

পাঁচ

তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে 'কিষণ গ্রহ' তথা সিপর মেগের উগ্র আচরণ প্রমাণিত হয়। আর এর পেছনে কারণ হিসেবে উঠে আসে বহুল আলোচিত পার্থিব স্মারক কয়েন। যেখানে লুকিয়ে আছে সিপর মেগের একটি বিশেষ শখ। না, যুদ্ধ করাটা তার শখ নয়। শখ হলো ভিন্ন ভিন্ন কয়েন সংগ্রহ করা। এ ঝোঁকটি সিপর মেগের মধ্যে শৈশব থেকে ছিল বলে জানা যায়।

ছয়

গ্রহসংঘের মহাপরিচালক শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কিছু চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নেন। যা সুপিরিয়রদের নীতিগতভাবে মেনে নিতে হবে। আরোপিত সিদ্ধান্ত হলো, আলোচিত কয়েনটির উপর কোনো গ্রহ-উপগ্রহের সত্ত্ব দাবি করা সম্পূর্ণ নিষেধ। এ কয়েনটি গোটা মানবজাতির সম্পদ। তাই এটি সুরক্ষিত রাখা হবে 'মানব জাদুঘরে'। যে জাদুঘরে মানবজাতির বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন শোভা পাচ্ছে।

গ্রহসংঘের এ প্রস্তাব মেনে নেবার পর থেমে যায় যুদ্ধ। সূচনা হয় নতুন যুগের। আর প্রাপ্য সম্মান লাভ করে 'পার্থিব স্মারক কয়েন'। ❑

শিশুসাহিত্যিক

অলৌকিক প্রকৃতি

মিজানুর রহমান মিথুন

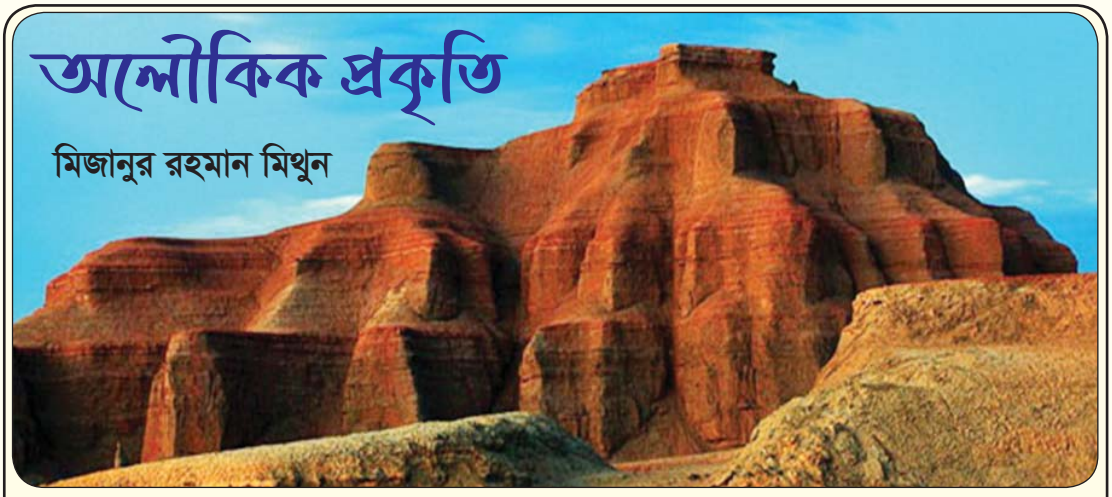

মগুইচেং

চীনের ঝিনজিয়াং অঞ্চলের একটি মরুভূমি হচ্ছে মগুইচেং। এর আক্ষরিক অর্থ শয়তানের নগরী। স্থানটি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত ও জনমানবশূন্য। অনেক অদ্ভুত ঘটনা এখানে ঘটে বলে ভ্রমণকারীরা জানিয়েছেন। দর্শনার্থীরা এই স্থানে রহস্যময় আওয়াজ, বিষণ্ন সুর ও গিটারের মৃদু ধ্বনি, বাচ্চাদের কান্না এবং বাঘের গর্জন শুনতে পেয়েছেন বলে দাবি করেন। এসব শব্দের কোনো উৎসের সন্ধান আজও কেউ পাননি। তবে এর রহস্য অনেকবার উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে।

নদীর মধ্যে আলো

মেকং নদীর 'নাগা ফায়ারবল' থাইল্যান্ডে অবস্থিত। নাগা ফায়ারবলকে থাই ভাষায় 'বাং ফাই ফায়ানাক' বা 'মেকং লাইট' বলা হয়। অনেকেই আবার এটাকে 'ভূতের আলো' বলে থাকে। মেকং নদীর উপর বছরে একবার দেখা যাওয়া এটি এক অদ্ভুত ঘটনা। এ কারণে স্থানীয়রা এর নামকরণ করেছেন 'নাগা ফায়ারবল'।

দ্য ওয়েভ (আরিজোনা)

এটি আমেরিকার একটি অদ্ভুত স্যান্ডস্টোন শিলার নিদর্শন। এটি সে দেশের উত্তরাঞ্চলে ইউটা রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। অ্যারিজোনা চমৎকার একটি প্রাকৃতিক স্থান। 'দ্য ওয়েভ' আকর্ষণীয় শিলা দিয়ে তৈরি। বিভিন্ন দেশের ফটোগ্রাফার ও প্রকৃতিপ্রেমীরা এটি দেখার জন্য এখানে ছুটে আসেন।

ড্যান্সিং ফরেস্ট

ড্যান্সিং ফরেস্ট রাশিয়ার কালিনিনগ্রাদ অবলাস্টের কুরোনিয়ান স্পিটে অবস্থিত। এটিকে বলা হয় পৃথিবীর এক অদ্বিতীয় রহস্যময় স্থান। এটি একটি প্রাচীন গাছপালা দিয়ে সৃষ্টি বন। এখানের গাছ দেখে মনে হবে এগুলো নৃত্য করছে। এ কারণে এর নাম 'ড্যান্সিং ফরেস্ট' রাখা হয়েছে। ড্যান্সিং ফরেস্টের সৌন্দর্য দেখার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ প্রতি বছর ছুটে আসে।

অদ্ভুতুড়ে

মেজবাউল হক

কুসংস্কারের পর্বতমালা

এই পর্বতমালা আমেরিকার ফিনিক্সের পূর্ব দিকে অবস্থিত। আর নামেই বুঝা যাচ্ছে এই পর্বতের বৈশিষ্ট্য। যার স্থানীয় নাম- 'Superstition Mountain' ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৮০০ শতাব্দীতে জ্যাকব ওয়াল্টজ নামের এক লোক অনেক বড়ো একটি স্বর্ণের খনি আবিষ্কার করেন এই পর্বতমালায়। তখন থেকে এই পর্বতের একটা নামকরণ হয় 'Lost Dutchman's Goldmine'। জ্যাকব ওয়াল্টজ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই স্বর্ণের খনির কথা গোপন রেখেছিল। এরপরে যখন এই ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছিল তখন অনেক মানুষ ওখানে স্বর্ণের সন্ধানে গিয়ে মারা পড়েছে। সেই থেকে শোনা যায়, এসব নিহত হওয়া মানুষদের আত্মা নাকি এখনও ঘুরে বেড়ায় এই পর্বতমালাতে।

অনেকেই বলেন, এই সোনার খনিকে পাহারা দেয় Tuar-Tums নামের এক ধরনের প্রাণী। যারা বসবাস করে সেই পর্বতের নিচে থাকা অজস্র টানেলে। এপাচি গোত্রের লোকজনেরা বলেন, এই পর্বতমালা নাকি দোজখের মূল দরজা।

পুতুলের দ্বীপ

'দ্য আইল্যান্ড অব ডলস', ছোট্ট এক দ্বীপ। ভয়ংকর সব পুতুল ওই দ্বীপের বাসিন্দা। ওইসব পুতুলের কোনোটার হাত নেই, কোনোটার পা নেই, কোনোটার আবার চোখ বা মাথা নেই। চারদিকে সবুজ, নিস্তব্ধতার মধ্যে বাতাসে দোল খাচ্ছে এইসব ভয়ংকর পুতুল। সব মিলিয়ে গা ছমছমে দ্বীপটির পরিবেশ। অনেক সাহসী বীরেরও বুক কেঁপে ওঠে এই দ্বীপটিতে গেলে।

মেক্সিকো সিটি থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণে সোচিমিলকোতে ওই রহস্যময় পুতুল দ্বীপের অবস্থান। দ্বীপটি ঘিরে ছড়িয়ে আছে নানা কিংবদন্তি। কথিত আছে, এই দ্বীপে পুতুল নিয়ে খেলছিল তিন মেক্সিকান শিশু। খেলাচ্ছলে তারা পুতুলের বিয়ে দেয়। খেলার সময় হঠাৎ একটি শিশু উধাও হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পাশের একটি খালে সেই শিশুটির মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেই থেকে সাধারণ মানুষের কাছে এই দ্বীপটি হয়ে ওঠে ভয়ংকর এক দ্বীপ এবং লোকমুখে প্রচলিত হয়ে আসছে দ্বীপটিকে ঘিরে নানা কাহিনি। এই পুতুলগুলো দ্বীপে আপনা-আপনি আসেনি। ডন জুলিয়ান সানতানা নামের এক লোক

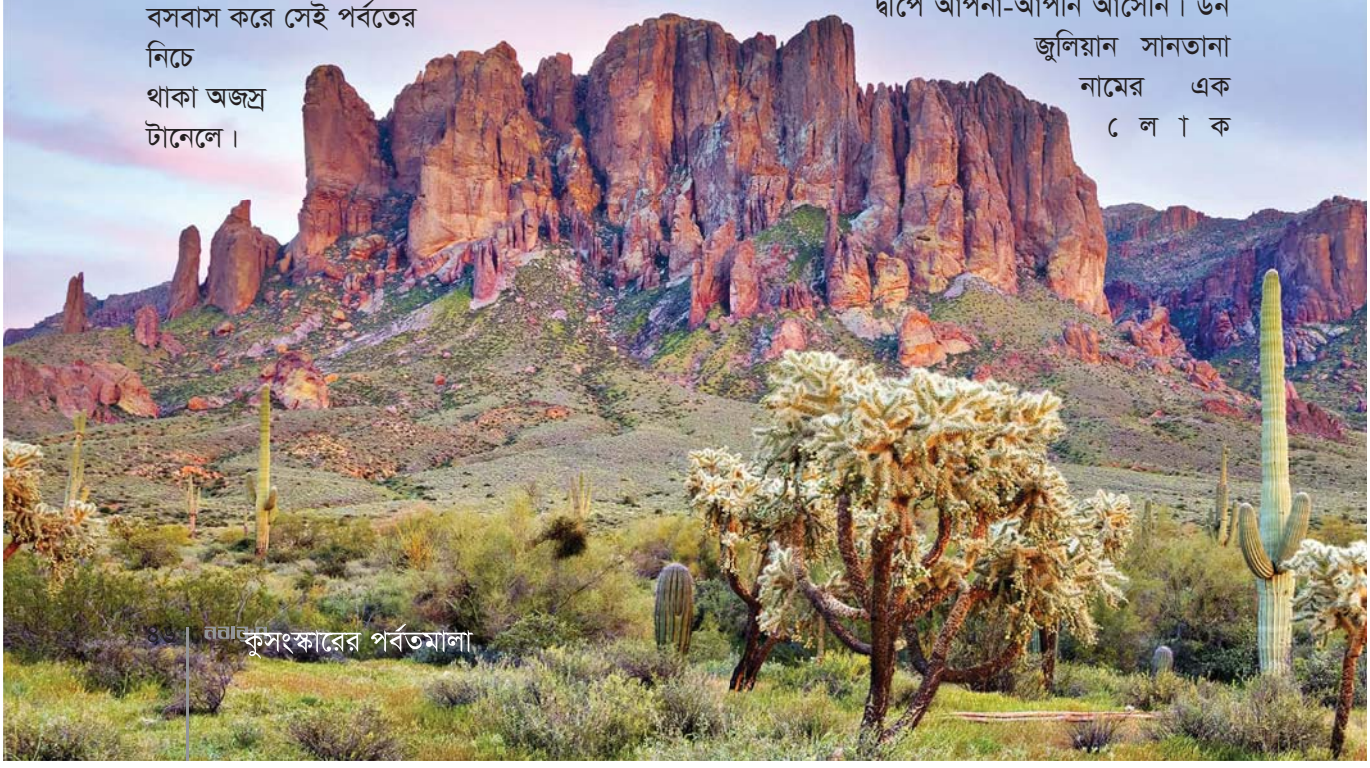

কুসংস্কারের পর্বতমালা

১৯৫০ সালের দিকে এই দ্বীপটিকে ধ্যান করার জন্য বেছে নেন। তার কাছে নাকি মৃত শিশুটির আত্মা আবদার করেছিল যে, অনেক পুতুল এনে দ্বীপের চারপাশে টাঙিয়ে দেওয়ার জন্য। এরপরই জুলিয়ান তার আশ্রমে চাষের সবজির বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে নষ্ট পুতুল সংগ্রহ করতে থাকেন এবং দ্বীপের নানা জায়গায় টাঙিয়ে দিতেন শিশুটির আত্মাকে খুশি করার জন্য। এভাবেই দ্বীপের প্রত্যেকটি গাছে, পরিত্যক্ত বাড়িতে ঝুলে আছে পুতুলগুলো। অনেকে মনে করেন এ সবই জুলিয়ানের মনগড়া কাহিনি। দীর্ঘ ৫০ বছর তিনি এই দ্বীপে একাকি বসবাস করেন।

এ দ্বীপে ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে ঘটে যায় এক রহস্যময় ঘটনা। ওইদিন ডন জুলিয়ান সেই খালটিতে মাছ ধরছিলেন, যে খালে শিশুটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। হঠাৎ তার মনে হয়, পানির নিচ থেকে কেউ একজন তাকে ডাকছে। এর কিছুদিন পর সেখান থেকে উদ্ধার হয় ডন জুলিয়ানের মৃতদেহ।

প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে মেক্সিকান সরকার ১৯৯০ সালেই এই দ্বীপটিকে 'ন্যাশনাল হেরিটেজ' ঘোষণা করে এবং দ্বীপটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে পর্যটন এলাকা বানানোর উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পর্যটকরা কদাকার পুতুল দেখে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেন এই অজুহাতে দ্বীপটিতে যেতে ভয় পান। সারা বছরে খুব বেশি পর্যটক এই দ্বীপে আসেন না। আর সেখানে পর্যটকেরা গেলে এখনো সাথে করে পুতুল নিয়ে যান এবং টাঙিয়ে দেন দ্বীপের কোনো এক জায়গায়।

ইস্টার দ্বীপ চিলি

অদ্ভুত রহস্যে ঘেরা একটি দ্বীপ। নেই কোনো গাছপালা। আসে না কোনো পাখি। জনমানবহীন দ্বীপে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত পাথরের মূর্তি। লম্বায় প্রতিটি প্রায় ৩০ ফুট। আগলে রেখেছে গোটা দ্বীপকে। দৈর্ঘ্য ২৪ কিলোমিটার। চওড়ায়

১৬ কিলোমিটার। এটি চিলির অধীনস্থ দ্বীপ। চিলি এই দ্বীপ থেকে ৩০০০ কিলোমিটার দূরে। ১৭২২ সালের ইস্টার রবিবার এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন ডাচ অভিযাত্রী জেকব রগ্গিভিন। তাই নাম দিয়েছিলেন ইস্টার আইল্যান্ড। অন্য নাম রোপা নুই। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উপর রয়েছে দ্বীপটি।

ইতিহাসবিদরা মনে করেন, ১৪০০ থেকে ১৬৫০ সালের মধ্যে পাথর খোদাই করে গোটা দ্বীপে প্রায় ৮০০ মোয়াই খোদাই করা হয়। এক একটি শিলা খোদাই করে এক একটি মূর্তি তৈরি করা হয়েছিল। এক একটির ওজন কয়েক টন। কোনোটি ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। এই মূর্তিগুলিকেই বলা হয় মোয়াই। এই মোয়াইগুলো আজও স্পষ্ট নয়, কে বা কারা তৈরি করেছিলেন বা কেন তৈরি হয়েছিল সেগুলো?

দ্বাদশ শতকে এই দ্বীপে লোকসংখ্যা ছিল তিন থেকে চার হাজার জন। ১৮৭৭ সালে ইউরোপীয়রা যখন এই দ্বীপে পৌঁছায়, তখন জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১১১ জন। জনসংখ্যা কমার সঙ্গে সঙ্গে কমেছে গাছ। এখন ইস্টার দ্বীপে একটি গাছও নেই। তবে অনেকে মনে করেন, শুধু গাছ নয়, ইঁদুরের কারণেও দ্বীপটি জনমানবশূন্য। দ্বীপে ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে মাটি আলগা করায় সব গাছ উপড়ে পড়ে যায়। ইঁদুরের কারণে এখানে প্লেগ মহামারি ছড়ায়। তার কারণেও জনমানবশূন্য হয় এই দ্বীপ।

রহস্যময় দ্বীপ বাল্ট্রা

একদমই ভিন্ন, অদ্ভুত ও রহস্যে ঘেরা দ্বীপ বাট্রা। দক্ষিণ আমেরিকার ইকুয়েডরে নিকটবর্তী ১৩টি দ্বীপের মধ্যে বিশেষ একটি দ্বীপ। নেই কোনো জনবসতি। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় হওয়ায় এই দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, বৃষ্টির একটি ফোঁটাও পড়ে না এখানে। অনেক ওপর দিয়ে বৃষ্টি অন্যপাশে গিয়ে পড়ে। বৃষ্টি যতই প্রবল হোক, সেই দ্বীপে পড়ে না এক ফোঁটাও।

এই দ্বীপটির ভেতর ভিন্ন ধরনের একটি শক্তি কাজ করে। যার প্রভাবে একের পর এক রহস্যময় ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটেছে। বাল্ট্রাতে পৌঁছালেই নাবিক বা অভিযাত্রীর কম্পাস অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করে। সব সময় উত্তর দিক নির্দেশকারী কম্পাস এখানে কোনো সময় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আবার দিক নির্দেশক কাঁটা ইচ্ছামতো ঘুরতে থাকে অথবা উলটাপালটা দিক-নির্দেশ করে। সবচেয়ে রহস্যজনক ব্যাপার হলো বাল্ট্রা দ্বীপের ওপর বিমান থাকাকালীনও এমন অদ্ভুত আচরণ করে কম্পাস।

আবার এই দ্বীপ পার হলেই সব ঠিক হয়ে যায়। বাল্ট্রার আরেকটি অদ্ভুত দিক হলো, এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কারোর মাথা হালকা হয়ে যায়। অজানা-অচেনা কোনো এক জায়গায় হারিয়ে যাওয়ার আশ্চর্য রকম অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলে মনকে। দ্বীপ থেকে চলে আসার পরও কিছুদিন সেই আশ্চর্য অনুভূতির রেশ থেকে যায়।

বাল্ট্রায় নেই কোনো উদ্ভিদ, প্রাণী বা কীটপতঙ্গ। প্রাণীগুলো বাল্ট্রাকে এড়িয়ে পাশের দ্বীপে চলে যায়। এমনকি উড়ন্ত পাখিগুলো বাল্ট্রার কাছে এসে ফিরে যায়। দেখলে মনে হয় যেন কোনো দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে তারা। এই দ্বীপের রহস্য নিয়ে কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। বিজ্ঞানীরা আজও এ রহস্যের কোনো কূলকিনারা করতে পারেননি।

কঙ্কালের হ্রদ

হিমালয়ের পাশেই আছে একটি বরফ উপত্যকা। আর সেখানেই রয়েছে একটি বিশাল হ্রদ। এ হ্রদের মধ্যেই আবিষ্কৃত হয়েছে শত শত মানব কঙ্কাল। এটি ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অন্যতম উঁচু পর্বতমালা। যার আসল নাম 'রূপকুণ্ড লেক'।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে জানা যায়, এ হ্রদটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে ১৬ হাজার ফুট ওপরে। চারপাশে ও বরফের নিচে শুধু মানুষের কঙ্কাল। ১৯৪২ সালে 'কঙ্কাল হ্রদটি' আবিষ্কার করেন একজন টহলরত ব্রিটিশ বনরক্ষী। এ হ্রদটি সব সময়ই বরফে ঢেকে থাকে, তাই কঙ্কালগুলো বরফের মধ্যেই চাপা থাকে। শুধুমাত্র তুষার গলেই কঙ্কাল দৃশ্যমান হয়। হ্রদটি আবিষ্কারের ৫০ বছরের বেশি সময় পার হলেও কঙ্কালের বিষয়টি এখনো অজানা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, যেসব দেহাবশেষ পাওয়া গেছে এগুলো তীর্থযাত্রীদের হতে পারে, যারা ভ্রমণকালে একসঙ্গে মারা গেছেন। এখন পর্যন্ত হ্রদটিতে ৬০০ থেকে ৮০০টি কঙ্কাল পাওয়া গেছে। স্থানীয় সরকার হ্রদটিকে 'রহস্যজনক হ্রদ' অ্যাখ্যা দিয়েছে।

দ্য গ্রেট ব্লু হোল

পৃথিবীর ডাইভিং সাইটের মধ্যে অন্যতম 'দ্য গ্রেট ব্লু হোল'। এটি স্কুবা ডাইভারদের প্রিয় একটি জায়গা। মধ্য আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলের বেলিজ সিটি এলাকায় অবস্থিত। এর তলায় আয়নার মতো স্বচ্ছ পানি। জ্যাকুয়েস কস্টিউয়ের নজর আসে সমুদ্রের মাঝে এই জায়গাটি ১৯৭১ সালে। নীল পানির মধ্যে প্রবাল-শৈবাল দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটি দেখতে গর্তের মতো। দেখে মনে হবে সমুদ্রের মাঝে একটি চোখ। ৪০০ ফুট গভীর এই গর্তে নেই কোনো অক্সিজেন। প্রায় ২৯০ ফুট গভীরে অক্সিজেনের পরিবর্তে আছে পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত বিষাক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড।

এই পানির তলায় অসংখ্য গুহা ডুবুরিরা দেখতে পান। বেশির ভাগ গুহার প্রবেশপথ বন্ধ। অবশেষে, ডুবুরির দল একটি গুহা খুঁজে পান যার মুখ খোলা। কিন্তু গুহার ভিতর যা দেখলেন, তা দেখে রীতিমতো চমকে যান তারা। টর্চ জ্বালাতেই যা দেখলেন, নিজেদের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তারা। পানির তলায় রয়েছে মৃতদেহের সারি। মনে

করা হয়, যে ডুবুরিরা ব্লু হোলের গভীরে অভিযানে গিয়েছিলেন এই মৃতদেহগুলো তাদেরই। এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পর তারা আর বেশিক্ষণ পানির তলায় থাকতে পারেননি। তাদের কাছ থেকে মূলত গবেষকরা এসব তথ্য সংগ্রহ করেন। ❑

তথ্যসূত্র : বিভিন্ন অনলাইন পত্রপত্রিকা

গুপ্তকথা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

মস্কো মেট্রো-২

পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাদের দৃষ্টিতে রাশিয়ায় অবস্থিত সিক্রেট জোন মস্কো মেট্রো-২ পৃথিবীর সবচেয়ে গোপনীয় ও রহস্যময় স্থান। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো আন্ডারগ্রাউন্ড সিটি। মাটির নিচে পুরো শহরটি সম্পর্কে বাইরের পৃথিবীর কারো কোনো ধারণা নেই। এই সিক্রেট সিটির আয়তন, উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড সবই গোপন। মূলত গোপনীয়তার কারণেই এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। যেহেতু রাশিয়ানদের গোপন তৎপরতাগুলোর অনেক কিছুই এখান থেকে চালানো হয়, তাই রাশিয়ান সরকার কোনোমতেই চাইবে না পৃথিবীর কাছে সেগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ুক। আর এ কারণেই পুরো জায়গাটিকে কোনো প্রকার স্বীকৃতি না দিয়ে

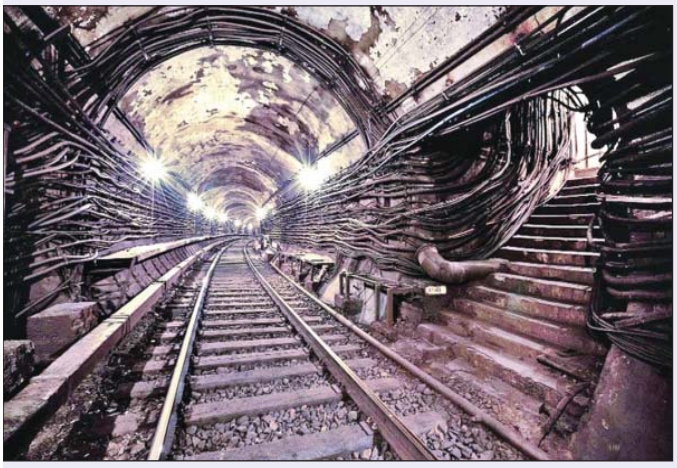

অস্তিত্বহীন করে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করছে কর্তৃপক্ষ। ধারণা করা হয়, এই আন্ডারগ্রাউন্ড সিটি তৈরি হয়েছিল স্টালিনের আমলে। আর এখান থেকেই রাশিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এফএসবি তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

রাফ মেনওয়িথ হিল

ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে সুরক্ষিত গোপন পাহাড়গুলোর একটি হচ্ছে রাফ মেনওয়িথ হিল। এখানে একটি ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, যেখান থেকে যাবতীয় গোপন গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানো হয়। ধারণা করা হয়, এখানকার ব্রিটিশ সামরিক বেসের সঙ্গে বিশ্বখ্যাত গুপ্তচর

নেটওয়ার্ক 'ইখেলন গ্লোবাল স্পাই নেটওয়ার্কিং'-এর যোগাযোগ রয়েছে। এটি ইংল্যান্ড এবং বন্ধুদেশ আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত। অনেকে মনে করেন, পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ইলেকট্রনিক্স মনিটরিং স্টেশনের অবস্থান এখানেই। আর সেই মনিটরিং স্টেশন এত বেশি পাওয়ারফুল যে, এখান থেকে বিশ্বের অনেক দেশের সব টেলিফোন এবং বেতার যোগাযোগ মনিটরিং করা সম্ভব।

এরিয়া ৫১

পৃথিবীর সবচেয়ে গোপন স্থানগুলোর একটি এরিয়া ৫১। এর অবস্থান আমেরিকার নেভাদা মরুভূমিতে। এটি একটি সামরিক ঘাঁটি। এ এলাকায় সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই এরিয়ার বাইরেও চারদিকে বিশাল এলাকাজুড়ে তৈরি করা হয়েছে নো ম্যানস ল্যান্ড। ধারণা করা হয়, আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো বড়ো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, গোপন গবেষণা সবকিছুই এখান থেকে পরিচালিত হয়। অস্ত্রশস্ত্র তৈরি, অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান তৈরির

জন্য এ ঘাঁটিকে ব্যবহার করা হয়। বেশ কিছু বিজ্ঞানীর দাবি- আমেরিকানদের ভিনগ্রহী প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে যে গবেষণা চলছে তার পুরোটাই এখান থেকে পরিচালিত হয়। বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে এখান থেকে ভিনগ্রহীদের সঙ্গে যোগাযোগও করা হয়েছে বলে দাবি করেন অনেকে। মূলত সিআইএ ও আমেরিকার এলিয়েন গবেষণার কেন্দ্র মনে করা হয় এরিয়া ৫১কে। ১৯৬৯ সালে চন্দ্র বিজয় নিয়ে যে বিতর্ক, তার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে এরিয়া-৫১ এর নাম। ধারণা করা হয়, চন্দ্রাভিযানের পুরো ঘটনাটি এখানকার নেভাদা মরুভূমিতে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ক্যামেরায় ধারণ করা। যেহেতু এ স্থানটি সম্পর্কে কারো কাছেই কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই, তাই এ সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না। কঠোর নিরাপত্তা আর গোপনীয়তার কারণে বছরের পর বছর এটি মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

আইস গ্র্যান্ড শ্রিন

সমগ্র বিশ্বের কাছে আরেকটি বিস্ময় ও রহস্যের নাম আইস গ্র্যান্ড শ্রিন। এটি জাপানে অবস্থিত। আইস

গ্র্যান্ড শ্রিন একদিকে যেমন জাপানের সবচেয়ে গোপনীয় স্থান, অন্যদিকে এটি সেখানকার সর্বোচ্চ পবিত্র স্থানও। আইস গ্র্যান্ড আসলে জাপানের ১০০টিরও বেশি মঠের সমষ্টি যা কিনা খ্রিস্টপূর্ব ৪ অব্দে নির্মাণ করা হয়েছিল। এ জায়গাটির ভিতরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। গবেষকদের মতে, এককালের জাপান সাম্রাজ্যের অনেক পুরানো এবং মূল্যবান নিদর্শন ও জরুরি নথিপত্র সংরক্ষিত আছে যা কখনই বিশ্বের সামনে আসেনি। কারণ সাধারণ কেউই এ পবিত্র জায়গাটিতে প্রবেশ করতে পারেন না। শুধু পূজারি অথবা জাপানের রাজপরিবারের লোকজন নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে এখানে প্রবেশ করতে পারেন। এই শ্রিনটি প্রতি ২০ বছর পরপর ভেঙে আবার নতুন করে তৈরি করা হয়। আর এক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হয় কঠোর নিরাপত্তা আর তীব্র গোপনীয়তা। মূলত পবিত্রতা ও গোপনীয়তা এত বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে পালন করা হয় যে, এই স্থানের রহস্য উন্মোচন একেবারেই অসম্ভব।

ভ্যাটিকান আর্কাইভ

প্রকৃত অর্থেই ভ্যাটিকান আর্কাইভ একটি রহস্য এবং গোপনীয়তার নগরী। তাই যুগ যুগ ধরেই মানুষের আগ্রহ আর রহস্যের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এই ভ্যাটিকান সিটি। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক পট পরিবর্তন ও গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনাপ্রবাহের সাক্ষী এই নগরী। ভ্যাটিকান সিটির ভিতরের সবচেয়ে রহস্যময় স্থানটি হলো ভ্যাটিকান সিটি আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা। এটিকে বলা হয়, 'স্টোর হাউস অব সিক্রেট'। অর্থাৎ গোপনীয়তার সংগ্রহশালা। এই জায়গাটিতে সাধারণ মানুষ তো নয়ই ভ্যাটিকান সিটির স্কলাররা পর্যন্ত সবসময় ঢোকার অনুমতি পান না। খুব অল্পসংখ্যক স্কলার বা পণ্ডিতেরই এখানে ঢোকার সৌভাগ্য হয় । তাও পোপের অনুমতি ছাড়া সেটি একেবারেই অসম্ভব। সুরক্ষিত এই জায়গাটিকে পবিত্রতার দিক থেকেও আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৮৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জায়গাটিতে প্রায় ৮৪ হাজার বই আছে। ধারণা করা হয়- খ্রিস্টান, মিশনারি এবং প্যাগান ছাড়া আরো অনেক ধর্ম আর

মতবাদের গোপন ডকুমেন্ট এখানে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই এই গ্রন্থাগারে। ভ্যাটিকান সিটির আইন অমান্য করা বা গ্রন্থাগারের গোপনীয়তা ভাঙার চেষ্টা কেউ কখনো করেনি। তাই গোপনীয়তাই ভ্যাটিকানের সবচেয়ে বড়ো রহস্য।

পয়েন্ট নিমো

পৃথিবী থেকে মহাকাশে সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয় ১৯৫৭ সালে। বর্তমানে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে প্রায় ৮ হাজার ২৬১টি স্যাটেলাইট। তার মধ্যে কার্যকর আছে প্রায় ৫০ শতাংশ। বাকি অকার্যকর স্যাটেলাইটগুলোর কী হয়? কোথায় যায় সেগুলো? বন্ধুরা, চলো জেনে নেই সেই অকার্যকর স্যাটেলাইটগুলোর পরিণতি সম্পর্কে।

স্যাটেলাইটের মেয়াদ সাধারণত ২-১৫ বছর পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমাদের মহাকাশে সবচেয়ে বিশালাকার যে স্যাটেলাইটটি আছে, সেটি হলো আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন। একটি ফুটবল মাঠের সমান সেই স্টেশনটিকে ১৫ বছরের আয়ু ধরে ১৯৯৮ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়। যদিও এরপর ২০৩১ সাল পর্যন্ত এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর কাছাকাছি কক্ষপথের অকার্যকর স্যাটেলাইটগুলো ফিরে আসে পৃথিবীতে। তাদের সমাধি হয় সমুদ্রে, পানির ৪ কিলোমিটার নিচে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত সেই স্থানটি ভূখণ্ড থেকে প্রায় ২ হাজার ৭০০ কিলোমিটার দূরে। পয়েন্ট নিমো খ্যাত সেই জায়গাটি পরিচিত স্যাটেলাইট সমাধি নামেও। কোনো দেশের অংশ না হওয়ায় এখানে কোনো আইনের প্রচলনও নেই। মেয়াদ পূর্ণ করে পয়েন্ট নিমোতে স্যাটেলাইট, রকেটের ভগ্নাংশ এবং স্পেস স্টেশন নিমজ্জিত হয়। চিরদিনের জন্য সেগুলো চলে যায় অন্ধকার সমুদ্রতলে। সমুদ্রের এই জায়গাটি 'দুর্গম সমুদ্র বিন্দু' হিসেবেও পরিচিত। ১৯৭১ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত পয়েন্ট নিমোতে মোট ২৬৩টি মহাকাশযানের ধ্বংসাবশেষ ফেলা হয়েছে।

ম্যাগনেটিক হিল

ভ্রমণপিপাসু কিছু মানুষ রয়েছেন এই পৃথিবীতে, যাদের স্বভাব হচ্ছে নিত্য নতুন জায়গায় ভ্রমণ করা। এদের মধ্যে কেউ আবার বিস্ময়কর আশ্চর্য ও রহস্যের গন্ধ খোঁজে। তবে কিছু কিছু পাহাড় রয়েছে

যেগুলোর রহস্য এখনও পর্যটক আর ভ্রমণপ্রিয় মানুষের কাছে এক দুর্বোধ্য আকর্ষণবিন্দু। পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন বেশ কয়েকটি চুম্বক পাহাড় বা গ্র্যাভিটি হিল যেমন- আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা বা সাইপ্রাস দ্বীপে এরকম একাধিক ম্যাগনেটিক হিল বা চুম্বক পাহাড় রয়েছে।

পৃথিবীর বেশ কিছু জায়গা আছে যেখানে অভিকর্ষ বল বিপরীতমুখী কাজ করে বলে মনে হয়। অর্থাৎ তরল বা কঠিন বস্তুকে গড়িয়ে নিচে নামার বদলে উপরে উঠছে বলে মনে হয়। এই জায়গাগুলোকেই গ্রাভিটি হিল বা অনেক সময় ম্যাগনেটিক হিল বলা হয়। এগুলো পাহাড়ি এলাকায় হাইওয়ে রাস্তাগুলোতে বেশি অনুভূত হয়। গাড়িতে বসে থাকলে মনে হয় পাহাড়ের আকর্ষণে গাড়ি উপরের দিকে উঠছে। এখান থেকেই হয়তবা ম্যাগনেটিক হিল নামের উৎপত্তি।

আমাদের পাশের দেশ ভারতের অন্যতম জনবিরল এলাকা লাদাখ। উত্তরে কুনলুন পর্বতশ্রেণি এবং দক্ষিণে হিমালয় পর্যন্ত রহস্যময়ী প্রকৃতি যেন ধরা দিয়েছে নানা রূপে নানা ছন্দে। মধ্যযুগে ইসলামিক পণ্ডিতরা এই অঞ্চলকেই ডাকত 'গ্রেট তিব্বত' বলে। দুর্গম হওয়া সত্ত্বেও এই এলাকায় মানুষের বসবাস সেই নিওলিথিক যুগ থেকেই। লাদাখের লেহ অঞ্চল থেকে কারগিলের পথে মাত্র ত্রিশ কিলোমিটার এগোলেই দেখা যায় কালো পাথরের প্রাচীরের মতো এক পাহাড়। এই পাহাড়ই লাদাখের বিখ্যাত ম্যাগনেটিক হিল বা চুম্বক পাহাড়।

চুম্বক পাহাড়ের উপর দিয়েই চলে গেছে রাস্তা। রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে গাড়ির গিয়ার নিউট্রালে দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করে গাড়ির ড্রাইভাররা শুধু ব্রেক ধরে থাকেন। আর তারপর যা হয়, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে চাইবেন না! চড়াই রাস্তা অথচ আপনার গাড়ি আপনা থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! যেন কোনো এক অদৃশ্য শক্তি গাড়িটিকে

সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। গাড়ির গতি ঘণ্টায় প্রায় বিশ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে যায় আপন ছন্দে ! এ এক অদ্ভুত রহস্য! এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া সব গাড়ির সঙ্গেই এমন ঘটে। আর এ কারণেই গাড়ির চালকরাও এই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি নিউট্রালে দিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দেন। ব্রেক থেকে পা সরিয়ে শুধু স্টিয়ারিং ধরে বসে থাকেন। আর গাড়ি এগিয়ে চলে প্রকৃতির রিমোট কন্ট্রোলে!

শুধু গাড়ি নয়, বিমানের ক্ষেত্রেও পাইলটরা ম্যাগনেটিক হিল অতিক্রম করার সময় সতর্ক থাকেন। নজর রাখেন যাতে বিমানের গতিপথ কোনো ভাবে বদলে না যায়।

তবে আরো অবাক করা ব্যাপার হলো, এই সড়কের ধারে বা এই অঞ্চলের যে-কোনো জায়গার কিছুটা উঁচু স্থানে দাঁড়ালে তীক্ষ্ণ রকমের এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এইসব কারণেই হয়ত স্থানীয়দের মাঝে এই পাহাড়টিকে ঘিরে প্রচলিত আছে বেশ কিছু মিথ ও উপকথা। স্থানীয় মানুষজন বিশ্বাস করেন এই পাহাড়ের এক ব্যাখ্যাতীত অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে। ও পথে গেলে সেই শক্তির অতিমানবিক আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব। আবার কারো কারো মতে, এই সড়কের বুকেই লুকিয়ে আছে মহাপ্রস্থানের পথ। সোজা স্বর্গে যায় সেই রাস্তা। যারা পুণ্যবান, কেবল তাদেরই আকর্ষণ করে সেই পথ।

যদিও বিজ্ঞানীরা এই এলাকায় যেসব অতিপ্রাকৃত শব্দ শোনা যায়, সেটিকে ভৌতিক শব্দ বলতেও নারাজ। আসলে প্রকৃতির অমোঘ খেয়ালে এই পাহাড় আর তার আশপাশের এলাকা ঘিরে রয়েছে একটা শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র। বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে এমন গ্র্যাভিটি হিল আছে সেখানেই কিছু কিছু বিজাতীয় শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। এই শব্দ চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের তরঙ্গে ঘর্ষণের ফলে তৈরি হয়। এছাড়াও এই ম্যাগনেটিক হিলের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জলও অনেকসময় গ্র্যাভিটির সূত্র ধরে ভিন্ন দিকে বয়ে চলে, তার দরুণও শব্দের সৃষ্টি হয়। ❑

কোলাব্যাঙ

মাহমুদ নাজীব

ও কোলাব্যাঙ
এত ডাকিস ক্যান
মেলে দু'ঠ্যাঙ
করিস ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ

বৃষ্টি এলে ঝুম
নেই তোদের ঘুম
যদি হয় সর্দি
ডাকবে কে বদ্যি।

সারা বছর কোথায় থাকিস
বল আমায় বল।
বরষা এলেই দেখি
তোদের কত্ত বড়ো দল।

একাদশ শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বিশ্বের বিস্ময়

মো. জামাল উদ্দিন

ডেথ ভ্যালি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রহস্যপ্রেমী মানুষদের কাছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত ডেথ ভ্যালি খুবই পরিচিত এক নাম। পৃথিবীর অন্যতম রহস্যময় এই স্থানটির তুলনা হয় না। কিন্তু এটিই পৃথিবীর নানা রহস্য ও বিস্ময়ের দেখা মিলে এই ডেথ ভ্যালিতে। ডেথ ভ্যালিতে চলন্ত পাথর দেখা যায়। যে পাথরগুলোকে দেখলে মনে হয় এরা নিজেরাই নিজেদের স্থান পরিবর্তন করছে। পাথরগুলোকে অবশ্য চলমান অবস্থায় কেউ কখনো দেখেনি। কিন্তু বালুর উপর রেখে যাওয়া ছাপ থেকে বোঝা যায় এরা স্থান পরিবর্তন করছে। কয়েক পাউন্ড ওজনের এসব ভারী পাথরগুলো নিয়ে আছে নানান কল্পনা। কেউ কেউ মনে করেন এখানে বিশেষ ধরনের এক চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, যার প্রভাবে পাথরগুলো স্থান পরিবর্তন করে। আবার কারো কারো ধারণা এগুলো আসলে এলিয়েনদের কারসাজি।

সবচেয়ে উত্তপ্ত স্থান। ১৯৭২ সালে এখানকার ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল প্রায় ২০০ ফারেনহাইট। ডেথ ভ্যালির এ তাপমাত্রা মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমিকেও হার মানায়। তবুও ডেথ ভ্যালি দেখতে প্রতি বছর প্রায় ৪ লক্ষ মানুষ এখানে ভীড় জমায়।

মাদিদি উদ্যান, বলিভিয়া

বলিভিয়ার মাদিদি উদ্যান হলো দেশটির জাতীয় উদ্যান। মনভোলানো সৌন্দর্যের আধার মাদিদি উদ্যানে প্রথম পা রাখলে মুগ্ধ হতেই হবে। কিন্তু বাস্তবে এটি মারাত্মক বিষাক্ত ও ভয়ংকর স্থান। পৃথিবীর বিষাক্ত ও ভয়ংকর সব উদ্ভিদের দেখা পাওয়া যায় এখানে। এসব উদ্ভিদ এতটাই বিষাক্ত যে, মানবদেহের সাথে সামান্য স্পর্শে চুলকানি থেকে শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। এমনকি কিছু উদ্ভিদের সংস্পর্শে এলে মৃত্যুও অনিবার্য। শরীরের সামান্য কোনো ক্ষত নিয়ে এই উদ্যানে এলে সেই ক্ষত এখানকার পরজীবি দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। সংক্রমিত হয়ে সামান্য এসব ক্ষতই হয়ে উঠতে পারে মৃত্যুর কারণ। ❑

el

তাফাজ্জল তালুকদার

বর্ষা এলে উদাম গায়ে বৃষ্টি ভেজার আনন্দে,
কাঁদামাটি জলে গড়াগড়ি কদম ফুলের গন্ধে।
সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে ফুটবল কিনে খেলা,
কলাগাছের ভেলা বানিয়ে কাটিয়ে দিতাম বেলা।

ক্লাস ফাঁকি দিয়ে লুডডু আর খেজুর দানা,
শিমের বিচি চাউল ভাজার মজমায় ডেকে আনা।
হিজল গাছে উঠে লাফিয়ে পানিতে পড়া,
আজ নেই বর্ষার আনন্দ হৃদয়ে জাগে সাড়া।

বর্ষা আসে বর্ষা চলে যায় সাধ জাগে আজ,
বনবীথি পাতা- পল্লবে নববধূ রূপে সেজেছে সাজ।
বারবার ফিরে যেতে চায় সেই অবুঝ দিনগুলোর গল্প,
আজ পেরেসান হয়ে খুঁজিয়া বেড়াই সময় যেন অল্প।

ব্যাঙের মাথায় ছাতি

নকুল শর্ম্মা

বৃষ্টির দিনে চলছে ব্যাঙটি
মাথায় দিয়ে ছাতি,
ছাতির উপর চড়লো বসে
কোলাব্যাঙের নাতি।

ছাতির উপর নাতি বসে
চলছে হেলেদুলে,
দাদু ব্যাঙটি হোঁচট খেয়ে
পড়লো নদীর কূলে।

নাতি গেল মাঝনদীতে
ছাতি গেল উড়ে,
কোলাব্যাঙে নাতির খোঁজে
এদিক-সেদিক ঘুরে।

হঠাৎ দেখে ছাতির উপর
নাতি বসে আছে,
তাই খুশিতে কোলাব্যাঙে
খোঁড়া পায়ে নাচে।

মাছরাঙা ও পুঁটি

কবির কাঞ্চন

পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখি
মাছরাঙা এক পাখি
ধরতে শিকার তীক্ষ্ম করে
রাখছে দুটি আঁখি।

একটু পরে হঠাৎ করে
ঠোঁট ঢুকিয়ে জলে
শক্তি দিয়ে ধরলো চেপে
পুঁটি মাছের গলে।

ব্যথার চোটে কাঁদছে পুঁটি
লেজ নাচিয়ে জোরে
মাছরাঙাকে বলছে আবার
দে না ছেড়ে ওরে।

হেসে উঠে মাছরাঙা কয়
আজকে তোকে খাব
পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে আমি
শক্তি ফিরে পাব।

যতই কাঁদিস কাজ হবে না
কান্নাকাটি থামা
আসবে না তোর বন্ধু-স্বজন
আসবে না তোর মামা।

বৃক্ষ বন্ধু

এম. আবু বকর সিদ্দিক

বৃক্ষ বন্ধু ডাকে তোমায়
নেড়ে সবুজ পাতা,
তপ্ত রোদে ক্লান্ত হলে
মাথায় ধরে ছাতা।

আপদ কালে যখন তোমার
পকেটটা হয় ফাঁকা,
আত্মবলি দিয়ে বন্ধু
আনে নগদ টাকা।

কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে
বায়ু করে শুদ্ধ,
অক্সিজেন না দিলে বন্ধু
জীবনটা হয় রুদ্ধ।

গাছগাছালি জীবনসঙ্গী
থাকুক চতুর্পাশে,
বৃক্ষরোপণ করো সবাই
আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে।

সোনার ময়না

কনক কুমার প্রামানিক

সোনার ময়না পাখিটাকে
যতন করে রাখি,
অনেক ভালোবাসি তবুও
শুধুই দেয় ফাঁকি।

বুকের মাঝে পিঞ্জিরাতে
ময়না পুষে রাখি,
সাবধানে আর চুপিসারে
বারবার যে দেখি।

আপন আপন ভাবি যত
সেই তো ভাবে পর,
উড়াল দিতে চায় আকাশে
ছেড়ে নিজের ঘর।

মেঘ বালিকা

মিনহাজ উদ্দীন শরীফ

পাখনা মেলে ওই আকাশে
যাচ্ছিস তোরা কে?
আমি হলাম চাঁদের বুড়ি
সঙ্গে আমায় নে।

দু-দিন ধরে গায়ে ব্যথা
হাতে পাই না বল;
একটু এসে দে না মুখে
সাত-সমুদ্রের জল।

কাছে এসে বলল তারা
আমরা দুজন মেঘ বালিকা
মেঘালয়ে ঘর;
যখন খুশি তখন ছুটি
আকাশ-পাতাল সর্ব স্থানে
ডানায় করে ভর।

ছোটোদের ছড়া

শান্তি

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

সুখে শান্তিতে কাটছিল দিন
হঠাৎ আসলো ঝড়
ক্লাস নাইনে উঠলাম আমি
শান্তির যেথা নাই খবর।

ধুকে ধুকে মারছে আমায়
পদার্থ ও রসায়ন
পড়লেও মনে থাকে না
মৌল, যৌগ, আয়ন।

জীববিজ্ঞানে নেষ্টেড হায়ারার্কি
আর কোষ বিভাজন,
ধাপগুলো মনে থাকে না
পড়লেও আমরণ।

শেষ হয়নি আরো আছে
উচ্চতর গণিত
এক এ্যাপোলোনিয়াসের উপপাদ্যেই
হয়ে যাচ্ছি চিত।

সুখ খুঁজছি এদিক-ওদিক
হয়ে আমি হন্য,
নাইনে উঠার পরে আমার
জীবনটাই বিষণ্ন।

নবম শ্রেণি
হলিক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

বৃষ্টি

আবির হোসেন

বর্ষাকালে হঠাৎ করে
হয় যে টাপুরটুপুর বৃষ্টি,
আকাশ জুড়ে কালো মেঘে
নেয় কেড়ে মোদের দৃষ্টি।

বৃষ্টি নামে পল্লি গাঁয়ের
বাংলার মাঠে-ক্ষেতে
বল নিয়ে ছেলেরা সব
খেলায় উঠে মেতে।

সপ্তম শ্রেণি, যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

বৃষ্টি নামে

সানজিদা রীমা

ঝমঝমা ঝম বৃষ্টি নামে
মাঠে-ঘাটে টিনের চালে,
মিষ্টি সুরে বৃষ্টি নামে
নদী-খালে পদ্ম বিলে।

বৃষ্টি নামে সকাল-দুপুর
শান্ত নদীর ভরা দু'কূল
বৃষ্টি নামে কদম ফুলে
দোলনচাঁপা হাওয়ায় দুলে।

বৃষ্টি নামে সবুজ মাঠে
দস্যিরা সব খেলায় মাতে
বৃষ্টি নামে ভাসায় ভেলা
আনন্দে কাটে বেলা।

দশম শ্রেণি
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

এসএসসিতে এগিয়ে মেয়েরা

চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের দিক দিয়ে এগিয়ে ছিল মেয়ে শিক্ষার্থীরা । এবার ফলাফল প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, পাসের হার এবং ফলাফলের সর্বোচ্চ সূচক জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক দিয়েও ছেলেদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল মেয়েরা।

২৮শে জুলাই এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলের তথ্য বলছে, এবারের পরীক্ষায় মোট ২০ লাখ ৪১ হাজার ৪৫০ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থী ছিল ১০ লাখ ৩১ হাজার ৬৪৭ জন এবং আর ছেলে শিক্ষার্থী ১০ লাখ ৯ হাজার ৮০৩ জন। মোট পাস করেছে ১৬ লাখ ৪১ হাজার ১৪০ জন। এর মধ্যে মেয়ে ৮ লাখ ৪৪ হাজার ৭৩৬ জন এবং ছেলে ৭ লাখ ৯৬ হাজার ৪০৪ জন। অর্থাৎ ৪৮ হাজার ৩৩২ জন মেয়ে শিক্ষার্থী বেশি। এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৮০ দশমিক

৩৯। এর মধ্যে মেয়েদের পাসের হার ৮১ দশমিক ৮৮। আর ছেলেদের পাসের হার ৭৮ হাজার ৮৭। এবারের পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১ লাখ ৮৩ হাজার ৫৭৮ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ৯৮ হাজার ৬১৪, আর জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রের সংখ্যা ৮৪ হাজার ৯৬৪। অর্থাৎ ছাত্রদের চেয়ে ১৩ হাজার ৬৫০ জন বেশি ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরও জিপিএ-৫ ও পাসের হারে এগিয়ে ছিল মেয়ে শিক্ষার্থীরা। ❑

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

ফারিন আজিজ, দ্বিতীয় শ্রেণি, আরামবাগ গার্লস স্কুল, ঢাকা

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি:

১. বর্তমান বিশ্বের সপ্তাশ্চার্যের একটি, ৩. তাজমহল কোন দেশে অবস্থিত, ৫. এক ধরনের মোটর যান, ৬. একটি বিশ্বখ্যাত খাল, ৮. রাস্তা, ৯. যুদ্ধ, ১০. অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, ১৪. চড়ুইভাতি

উপর-নিচ

১. আফ্রিকার একটি দেশ, ২. এক ধরনের পাললিক শিলা, ৪. পদার্থের একটি অবস্থা, ৭. না লিখে মনে মনে করতে হয় এমন অঙ্ক, ১১. সুসন্তানের জননী, ১২. একটি বাংলা মাস, ১৩. সংবাদপত্র

১.			২.	■	৩.		৪.
	■	■		■	■	■	
৫.		■	৬.		৭.		
	■	৮.		■		■	■
৯.		■		■	১০.		১১.
■	■	১২.	■	১৩.		■	
■	■		■		■	■	
■	১৪.					■	

ছক মিলাও

শব্দধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যে সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: প্রশান্ত মহাসাগর, অনন্তকাল, হাসপাতাল, পাহাড়, পাতাল, অনুসন্ধান, কারক, প্রয়াস

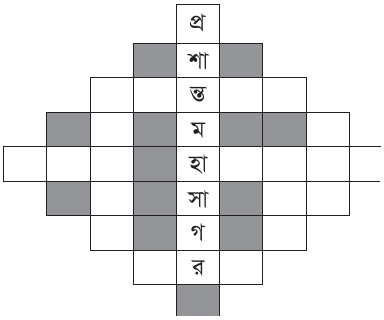

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫৭			৫৪		৫২	৩৯		৩৭
		৭২			৫১		৪১	
	৭৪			৪৯		৪৫		
	৮১		৬৯		৪৭		৪৩	
		৭৭		২৯		৩১		৩৩
	৭৯		৬৭		১৩			১০
৬৩			৬৬	২৭		১		৯
	২৩				১৫		৭	
২১				১৭		৩		৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৮	-		+	১	=	
+	■	-	■	*	■	*
	*	২	-		=	১
-	■	*	■	-	■	-
৭	*		-	৪	=	
=	■	=	■	=	■	=
	-	৩	*		=	১

কদম ফুল

মো. জুনায়েদ আহমেদ

সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে
সদ্য ফোটা কদম ফুল
সুবাস ভরা মিষ্টি গন্ধে
মন হয়ে যায় ব্যাকুল।

হলুদ সাদা রেণু ভরা
দেখতে লাগে চমৎকার
বর্ষায় কদম ফুলের রূপ
মন কেড়ে নেয় সবার।

সপ্তম শ্রেণি, এ কে এম এ আইডিয়াল কিন্ডারগার্টেন,
দেবিদ্বার, কুমিল্লা

m¤§vbx MÖnYi weÁwß

‘মাসিক নবারুণ’ পত্রিকায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে প্রকাশিত লেখার যে-সকল সম্মানিত লেখক সম্মানী গ্রহণ করেননি তাদের নামের তালিকা চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে www.dfp.gov.bd এবং নবারুণ ফেইসবুক পেজ Nobarun Potrika-এ প্রকাশ করা হয়েছে। যে-সকল সম্মানিত লেখক উল্লিখিত সময়ে লেখার সম্মানী গ্রহণ করেননি ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখের মধ্যে ডিএফপিতে যোগাযোগ করে তাঁদের সম্মানী গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখিত তারিখের মধ্যে সম্মানী গ্রহণ না করলে উক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

সিরাজুম মুনিরা বিভা, কেজি-ওয়ান, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুল, ঢাকা

ইসরাক হাসান আদৃক, সপ্তম শ্রেণি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক স্কুল, ঢাকা

রুতবাহ জামান শিজা, গ্রেড-৫, গ্লিনরিচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

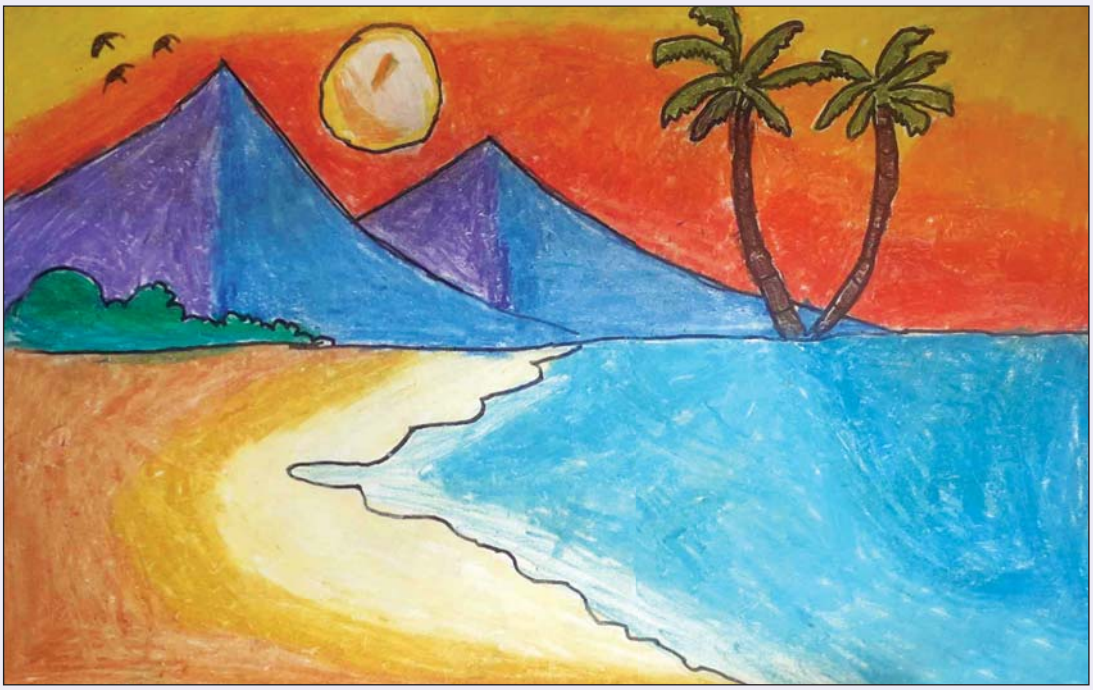

মো. আমিমুল ইহসান বসুনিয়া, পঞ্চম শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মুগদা শাখা, ঢাকা

ডেঙ্গু প্রতিরোধে

সচেতনতা

- ❑ জমে থাকা পানি নিয়মিত অপসারণ করতে হবে
- ❑ চারপাশের জায়গা পরিষ্কার পরিছন্ন রাখতে হবে
- ❑ পানি জমে থাকতে পারে এমন জিনিসপত্র উলটে রাখতে হবে
- ❑ ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে
- ❑ জানালাতে মশা প্রতিরোধক নেট ব্যবহার করতে হবে
- ❑ শরীরের অনাবৃত স্থানে মশা নিবারক ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে
- ❑ মশা নিধনের ওষুধ, স্প্রে কিংবা কয়েল ব্যবহার করা যেতে পারে
- ❑ পাতলা কিংবা ঢোলা পোশাক পরিধান থেকে বিরত থাকবেন
- ❑ শিশু এবং বয়স্কদের বিশেষ যত্ন নিয়ে নিরাপদে রাখবেন

Regd. Dha. 143, Monthly Nobarun, Vol-48, No-01. July 2023, Tk-20.00

Memorandum No: 15.00.0000.019.05.003.16-211/2022

উম্মে মেহজাবীন রাইশা, চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ভবন

১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা